খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, ইমাম, এনজিও কর্মীদের জন্য

সম্পাদনায়ঃ

মোঃ মাহফুজ আলী

জ্যোতিলাল বড়ুয়া

ড. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

প্রকাশনায়: **প্রকল্প ব্যবস্থাপক**
সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN)
সেচ ভবন, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-৯১১৭৮৬২, ০২-৯১৩৬২৭৪, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৭৫১৬
ই-মেইল: birtan_bd@yahoo.com, www.birtan.gov.bd

প্রথম প্রকাশ: **জুন, ২০১৫**

কারিগরী সহায়তায়:
ড. নার্গিস সুলতানা
রিসোর্স কনসার্ন
৫১ বড় বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ড. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
সচিব (অবসর প্রাপ্ত)
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

প্রচ্ছদ: **মোঃ মাহফুজ আলী, প্রকল্প ব্যবস্থাপক**
সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

মুদ্রণে:
মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন
ঢাকা-১২০৫
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৬৩৫০৮১
ই-মেইল: modinapublishers@gmail.com

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বানী	০৫
২	ম্যানুয়ালটির ব্যবহার	০৯
৩	মডিউল-১ খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক ধারনা	১১
৪	মডিউল-২ মূখ্য বা মূল পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ	১৪
৫	মডিউল-৩ গৌণ পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ	১৬
৬	মডিউল-৪ সুষম খাবার	২১
৭	মডিউল-৫ খাদ্যের পুষ্টিমান	২৫
৮	মডিউল-৬ পুষ্টিসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও রন্ধন পদ্ধতি	২৮
৯	মডিউল-৭ অপুষ্টিজনিত রোগ- রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার	২৯
১০	মডিউল-৮ বসত-বাড়ীতে শাক্- সবৃজির চাষ	৩৪
১১	মডিউল-৯ বাড়ীর আঙ্গিনায় ফল চাষ	৩৬
১২	মডিউল-১০ পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নে বনজ ও ভেষজ গাছের ভূমিকা	৩৮
১৩	মডিউল-১১ বাড়ীর আঙ্গিনায় হাঁস মুরগী ও গবাদি পশু পালন	৪২
১৪	মডিউল-১২ পুষ্টি উন্নয়নে মাছ চাষ	৪৬
১৫	মডিউল-১৩ পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	৪৮
১৬	মডিউল-১৪ নিরাপদ খাদ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৫৫
১৭	মডিউল-১৫ পুষ্টি উন্নয়নে নারীর ভূমিকা	৬১
১৮	মডিউল-১৬ বাংলাদেশের খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান	৬৫
১৯	ম্যানুয়াল প্রনয়ণে সহায়ক পুস্তিকা	৯০
২০	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	৯১

মতিয়া চৌধুরী এম.পি.
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বে অপুষ্টিজনিত সমস্যা বিদ্যমান। এ সমস্যার জন্য শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ঠিকমত হয় না। ফলে দেশের জনগণ একদিকে রুগ্ন, দুর্বল ও কর্মক্ষম হয়, অন্যদিকে মেধাহীন হয়ে দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। যা দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করে। খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সীমিত জ্ঞানই মূলতঃ এ অবস্থার জন্য দায়ী। তাই প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কৃষি হল খাদ্যশক্তি, প্রাণশক্তি, শ্রমশক্তি ও মেধাশক্তির প্রধান উৎস এবং এটি আবহমান বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মূল চালিকা শক্তি। সনাতন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির স্থলে আমাদের দেশে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়ছে এবং পেশা হিসেবে কৃষি জীবিকা নির্বাহের স্তর থেকে বানিজ্যিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশী মানসম্মত কৃষিজাত পণ্যের রপ্তনী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধীরে ধীরে আমাদের দেশে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প স্থাপিত হচ্ছে। ফসলের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ বিধায় কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যা অত্যন্ত প্রয়োজন দীর্ঘ ২১ বছর পর জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে। এর স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা 'সেরেস' পদকে ভূষিত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান কৃষি ও কৃষক বান্ধব সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য উৎপাদনে আধুনিক, উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার জোরদার করার স্বীকৃতি স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্প্রতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বর্তমান কৃষি ও কৃষক বান্ধব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ ফলে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশ-এ পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য টেকসই নিরাপত্তা তথা সকল নাগরিকের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে দেশের অপুষ্টি দূর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) দীর্ঘ দিন যাবৎ খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী, কৃষক কৃষিবিদ ও সর্ব সাধারণকে সচেতন, অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এর সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের সচেতন প্রতিনিধিদের খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক ধরণা, খাদ্যের মুখ্য ও গৌণ উপাদান, সুষম খাবার, খাদ্যের পুষ্টিমান ও পরিবেশ উন্নয়নে বনজ ও ভেষজ, গাছের ভূমিকা,বাড়ীর আঙ্গিনায় হাঁস মুরগী পালন,পুষ্টি উন্নয়নে মাছ চাষ, পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, নিরাপদ খাদ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

মাঠ কর্মীদের পুষ্টি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ম্যানুয়ালটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মতিয়া চৌধুরী এম.পি.

শ্যামল কান্তি ঘোষ
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ সমূহে অপুষ্টি একটি মারাত্মক সমস্যা। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলা ও শিশুরাই এর বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলা ও শিশুরাই এর প্রধানতম শিকার। বিগত দশকে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি ও পুষ্টিমান পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও মোট জনগোষ্ঠির একটি অংশ অপুষ্ঠির শিকার যার বড় কারণ পুষ্ঠি জ্ঞানের অভাব। আমরা জানি, অপুষ্ঠি শুধু মানুষের বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা, কর্মক্ষমতা ও আয়ুকেই প্রভাবিত করে না সর্বপরি সুস্থ সবল জনগোষ্ঠি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও দারুনভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলাদেশ সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি মান উন্নয়নে স্থায়ী কৌশলরূপে খাদ্যভিত্তিক বিভিন্ন পন্থা যেমন: খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্ঠিমান নিশ্চিতকরণ, খাদ্য বৈচিত্রতা, পুষ্ঠি শিক্ষা এবং খাদ্য প্রস্তুতে পুষ্টিমান সমৃদ্ধকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের সহজলভ্য, শুধু অণুপুষ্টির অবস্থার উন্নয়নই করেনা বরং সাধারণ পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নেই করেনা বরং সাধারণ পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলমান পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি (Nutrition Sensitive Agriculture) ও পুষ্টির নির্দিষ্ট পরিমাপকের (Nutrition Specific Measures) উপর বিনিয়োগ যে কোন জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে যা সর্বপরি দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিশেষ করে ফল-মুল, শাকসবজি, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, দৈনন্দিন আমিষ ও অণুপুষ্টির চাহিদা মেটায় বিধায় এ সকল খাবারের উৎপাদন ও গ্রহণের মাত্রা বাড়ানো এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি প্রচেষ্টা মুল লক্ষ্য।

আমি আনন্দিত যে, "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (বারটান অংঙ্গ)" প্রকল্পের আওতায় পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, ইমাম ও এনজিও কর্মীদের জন্য এ প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি তৈরী করা হয়েছে। যেখানে খাদ্য পুষ্টি উন্নয়নে সমন্বিত কৃষি ও স্বাস্থ্য ভিত্তিক কর্মসূচীর খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়সমূহ (যেমন: সুষম খাদ্য, খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিমান, পুষ্টিমান বজায় রেখে খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী ও রন্ধণ, পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ, বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ, পুষ্টি উন্নয়নে হাঁস-মুরগী পালন ও মাছ চাষ, খাদ্য বৈচিত্র্যতা, নিরাপদ খাদ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যথাযতভাবে) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আমি আশা করি, এ ম্যানুয়ালটি সকল স্তরের মাঠ কর্মীদের মধ্যে পুষ্টি জ্ঞানের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রচার, প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে কাজ করবে।

পরিশেষে, ম্যানুয়েলটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শ্যামল কান্তি ঘোষ

মোঃ মোশারফ হোসেন
নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
ও অতিরিক্ত সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। দেশের উন্নয়ন ও সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চিয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে কৃষি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দানদার জাতীয় ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। চাল রপ্তানিও শুরু হয়েছে এখনও মাছ, মাংস, দুধ, ফল ও শাক-সবজির উৎপাদন/গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আরও পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এর সাথে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে চর, হাওর ও দারিদ্রপ্রবণ এলাকায় পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়াও প্রয়োজন।

পুষ্টি তথা সুষম খাদ্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও চর্চা সীমিত। পুষ্টি জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে Bangladesh Institute of Reseaarch and Training on Applied Nutrition (BIRTAN) অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষা কারিকুলামে পুষ্টি বিষয় অন্তর্ভূক্তি, বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় মাধ্যমে পুষ্টি ও সুষম খাদ্য বিষয়ক জ্ঞান সম্প্রসারণ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে পুষ্টি বিষয়ক তথ্য ও কথিকা প্রচারের ব্যবস্থা। দামী খাদ্যই সুষম খাদ্য নয় বরং আমাদের আশেপাশে প্রচলিত দেশী খাদ্যগুলি থেকে সস্তায় সুষম খাদ্য গ্রহণ কারা যায়। শুধুমাত্র ভাতের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে খাদ্যভ্যাস পরিবর্তন করে আমরা এ সুষম খাদ্য পেতে পারি। এ বিষয়গুলো প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভূক্ত আছে।

পুষ্টি জ্ঞান, মানব সম্পদ ও জমির সর্বোত্তম ব্যবহার করার মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্রপ্রবণ এলাকার সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যেই সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় (BIRTAN) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, স্কুল শিক্ষক, ইমাম, এন.জি.ও কর্মী ও কৃষক-কৃষাণীদের সুষম খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের সাথে জড়িত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের এ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটিতে খাদ্য ও পুষ্টি, সংগ্রহত্তোর খাদ্য অপচয় রোধকল্পে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, হাঁস-মুরগি পালন নিরাপদ খাদ্য ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই ম্যানুয়ালটি মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও মাঠকর্মী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল শিক্ষক, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মী ও ইমাম/পুরোহিতদের পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

ম্যানুয়ালটিতে প্রকাশিত বিভিন্ন মডিউল, পুষ্টি জ্ঞান বৃদ্ধি ও চর্চায় সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস। ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ মোশারফ হোসেন

মোঃ মাহফুজ আলী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (অঃদাঃ)
সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি
নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

মুখবন্ধ

বিশ্বব্যাপী অপুষ্টি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। বাংলাদেশেও এ সমস্যা বিদ্যমান। বিশেষ করে চর, হাওড় ও দারিদ্রপ্রবণ এলাকার পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব, দারিদ্রতা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অপর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধাদি পুষ্টিহীনতার অন্যতম কারন। জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের জন্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি স্থায়ী ও টেকসই কৌশল হিসাবে বিশ্বব্যপী স্বীকৃত। সুষম খাদ্য যোগানে বসত-বাড়ীতে পুষ্টির চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্র্যতা, মৌলিক পুষ্টি জ্ঞান, খাদ্যের পুষ্টিমান, সুষম খাদ্য, সঠিক রন্ধন পদ্ধতি, খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরন ও সংরক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সমন্বিত কর্মকান্ডর তথা আত্ন-নির্ভরশীলতার মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এর ফলে সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার, দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ উন্নয়ন, সর্বোপরি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব। এ জন্য সকলকে খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন। সকলকে সচেতন করার জন্য প্রথমেই খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা দরকার। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা, ইমাম, এনজিও কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে বারটান দীর্ঘদিন যাবৎ খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী ও কৃষক-কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।

দেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১৪ইং হতে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে "সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পটি দেশের চর, হাওড় ও দারিদ্রপ্রবণ ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বারটান এ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চর, হাওড় ও দারিদ্রপ্রবণ এলাকার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, ইমাম ও এনজিও কর্মীদের ব্যবহারের জন্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রনয়ণ করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ ম্যানুয়ালের পাঠ্যক্রম প্রনয়ণের লক্ষ্যে বিগত ২০.০৪.২০১৫ইং তারিখে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশমালার ভিত্তিতে এ ম্যানুয়ালের পাঠ্যক্রম চুড়ান্ত করা হয়। চুড়ান্ত পাঠ্যক্রমগুলো একদিকে অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করবে, অন্যদিকে খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সহজতর হবে। ম্যানুয়ালটির মান উন্নয়নে গঠনমূলক মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রনয়ণকালে যাদের সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকার সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তা যারা মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সাধারণ মানুষের পুষ্টি সমস্যা সমাধানে আমাদের প্রয়াস "খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল" সকলের কাজে লাগলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

মোঃ মাহফুজ আলী

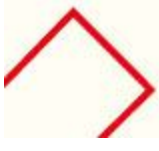

ম্যানুয়ালটির ব্যবহার

ম্যানুয়ালটিতে ১৬ টি মডিউল রয়েছে। প্রতিটি মডিউলে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। কর্মসূচীতে মডিউলগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে মডিউলগুলির বিষয়-বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হল।

মডিউল - ১: খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক ধারনা

খাদ্য কি, খাদ্যকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে, খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ,পুষ্টি উপাদান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

মডিউল - ২: মুখ্য বা মূল পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ

খাদ্যের মুখ্য বা মূল পুষ্টি উপাদানগুলি আমাদের শরীরের জন্য বেশী পরিমাণে লাগে। এই মডিউলে মূল পুষ্টি উপাদানগুলির কাজ, এদের উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মডিউল - ৩: গৌণ পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ

দেহে গৌণ পুষ্টি উপাদান খুব কম পরিমাণে দরকার হয়। এদের অভাবে নানা ধরণের অসুখ হয়। তাই এদের সম্পর্কে ভালভাবে জানা প্রয়োজন। এদের কাজ, উৎস ও পরিমাণ সম্বন্ধে এই মডিউলে বর্ননা করা হয়েছে।

মডিউল - ৪: সুষম খাদ্য

আমরা ক্ষুধা লাগলে খাবার খাই। যতবার ক্ষুধা লাগে ততবার খাই। কিন্তু খাওয়ার উদ্দেশ্য শুধু পেট ভরা বা ক্ষুধা মিটানো নয়। খাবার খাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল শরীরের সঠিক গঠণ বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, কাজে শক্তি যোগান এবং রোগ প্রতিরোধ করা । আমাদের শরীরের চাহিদানুযায়ী পুষ্টি উপাদান জোগান হচ্ছে কিনা তা জেনে খাদ্য তৈরী করা দরকার। খাদ্যে প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণ থাকলেই তা হবে সুষম খাদ্য। ঐ খাবার কিভাবে তৈরী করতে হয় এ মডিউলে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মডিউল - ৫: খাদ্যের পুষ্টিমান

প্রতিদিন আমরা নানা প্রকার খাবার একাধিকবার খেয়ে থাকি। আমাদের জানা প্রয়োজন, এসব খাবার থেকে আমরা কতটুকু পুষ্টি পেয়ে থাকি এবং তা প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট কি না। তাই আমাদের খাবার সুষম করার জন্য বিভিন্ন খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ জানা আবশ্যক। খাদদ্রব্যের পুষ্টি উপাদান বিশ্লেষণ করে পুষ্টিমান নির্ণয় করা হয়। কোন খাদ্যে পুষ্টি উপাদান কি পরিমাণে আছে, তা এই মডিউলে বলা হয়েছে।

মডিউল - ৬: পুষ্টিসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও রন্ধন পদ্ধতি

শরীরে শক্তি ও পুষ্টি যোগান দেয় খাদ্য। পুষ্টিসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও রন্ধন পদ্ধতি সঠিক না হলে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টির অপচয় হবে। যেমন - আমিষ, শর্করা, চর্বি বা তেল, ভিটামিন এবং খনিজ লবণ না পেলে শরীরে অপুষ্টি হবে। অপুষ্টি হলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। পরিণামে শরীরে রোগ হলে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এই মডিউলে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টি উপাদানসহ খাবার কিভাবে তৈরী করতে হয় সে সম্বন্ধে জানানো হয়েছে।

মডিউল - ৭: অপুষ্টিজনিত রোগ- রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার

এই মডিউলে অপুষ্টি ও স্বল্প পুষ্টিজনিত রোগ, রোগের আলামত, রোগ সম্বন্ধে বোঝা, রোগের কারণ ও কিভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মডিউল - ৮: বসত-বাড়ীতে শাক-সবজির চাষ

মডিউলটি শুরু করা হয়েছে বসত-বাড়ীতে কৃষিকাজের উপকারিতাসমূহের আলোচনার মাধ্যমে। পুষ্টি উপাদানের উৎস হিসেবে শাক-সবজি ও ফল-মূলের পরিচিতি এবং আমাদের খাদ্যে এদের অভাবজনিত অবস্থা কি তা জানানো হয়েছে। আমাদের দেশের বসত-ভিটায় বা আঙ্গিনায় বেশ জায়গা থাকে। এ বসত-ভিটায় সমন্বিত সবজি বাগান স্থাপনের মাধ্যমে পারিবারিক ও জনগোষ্ঠীর পুষ্টির উন্নয়ন করা যায়। একটি বসত-বাড়ীর কৃষি খামারে শাক-সবজির চাষ ও তা থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান পারিবারিক দৈনিক প্রয়োজনীয় চাহিদা কতটুকু পূরণ করতে পারে তা এই মডিউলে তুলে ধরা হয়েছে।

মডিউল - ৯: বাড়ীর আঙ্গিনায় ফল চাষ
মডিউলটিতে খাবারে ফলের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। বাড়ীর আঙ্গিনায় ফলের গাছ লাগানোর মাধ্যমে পরিবার ও জনসাধারণের পুষ্টির উন্নয়ন কিভাবে করা যায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

মডিউল - ১০: পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নে বনজ ও ভেষজ গাছের ভূমিকা
বন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। বন নানাভাবে আমাদের কাজে আসে। পরিবেশ উন্নয়নে একটি দেশের তেল বা খনিজ সম্পদ কোন না কোন সময়ে শেষ হতে পারে। কিন্তু বনজ সম্পদ কখনও ফুরায় না যদি এর সুরক্ষা ও পরিচর্যার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা থাকে। তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, বন সম্পদ সৃজনে ও সংরক্ষণে তুলনামূলকভাবে ব্যয় হয় অনেক কম। তাই বনকে বলা হয় নবায়নযোগ্য সম্পদের অফুরন্ত উৎস । পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নে ভেষজ গাছের উপকারিতা কি তা বর্ননা করা হয়েছে।

মডিউল - ১১: বাড়ীর আঙ্গিনায় হাঁস মুরগী ও গবাদি পশু পালন
কৃষিকাজের পাশাপাশি মানুষ হাঁস মুরগী ও গবাদি পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। মানুষের বসবাসের কাছাকাছি জায়গায় অর্থাৎ বসত-বাড়ীর আশেপাশে একটু জায়গা থাকলে সেখানে হাঁস মুরগী ও গবাদি পশু পালন করলে মানুষ একই সাথে আর্থিকভাবে লাভবান ও পুষ্টির জোগান পেতে পারে। এই মডিউলে মানুষ বসত-বাড়ীর কাছাকাছি জয়গায় কিভাবে পশু-পাখি পালন (হাঁস- মুরগি, গরু-ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি) করে পরিবারের প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান পেতে পারে তা এবং ব্যবহারকারীদের হাঁস-মুরগি ধরা ও পালনকালে নিরাপত্তার বিষয়ে বিশদ বর্ননা করা হয়েছে।

মডিউল - ১২: পুষ্টি উন্নয়নে মাছ চাষ
আদিকাল থেকেই মাছ মানুষের একটি প্রধান খাদ্য উপাদান। মাছ বাংলার মানুষের আমিষের একটি প্রধান উৎস। গ্রাম বংলার প্রায় প্রতিটি বসত-বাড়ী বা বাড়ীর কাছাকাছি পুকুর বা ডোবা থাকে। পুকুর/ডোবায় মাছ চাষ করে কিভাবে পরিবারে পুষ্টির উন্নতি করা যায় তা এ মডিউলে বর্ননা করা হয়েছে।

মডিউল - ১৩: পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ
পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ মডিউলটিতে খাদ্য প্রস্তুতের মূল নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুষ্টি অপচয় রোধ করা। এ ছাড়াও পরিচ্ছন্নভাবে খাদ্য তৈরী, খাদ্য নিরাপদ রাখা ও সংরক্ষণ করার নিয়মাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ঘরোয়াভাবে প্রধান প্রধান খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ও সংরক্ষণের যে সকল পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে তা এবং খাদ্য সংরক্ষণের উপকারিতার বর্ননা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বছর ধরে পুষ্টিকর শাক-সবজি ও ফল-মূলের সরবরাহের কৌশলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবহারকারীদের খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ভেজাল এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহ জানানো হয়েছে।

মডিউল - ১৪: নিরাপদ খাদ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম থাকার জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ কালে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক। খাদ্যদ্রব্যের মান ও গুনাগুণ যাতে সঠিক ভাবে,সঠিক পরিমাণে ও দীর্ঘদিন বজায় থাকে নিরাপদ খাদ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা মডিউলে তার বর্ননা দেয়া হয়েছে। খাদ্যে জীবানু সংক্রমণ হলে খাদ্যের গুনাগুণ ও মান কমে যায়, ফলে পুষ্টিমানও কমে যায় । খাদ্যে জীবানু সংক্রমণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় আছে। জীবানু সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে কিভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে রোগের ঝুঁকি কমানো যায় তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাবার পানি সংরক্ষণ এবং সাধারন অসুস্থতা যেমন- ঠান্ডা, জ্বর, ডায়রিয়া, ইত্যাদি ঘরে বসে কিভাবে যত্ন নেয়া যায় সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

মডিউল - ১৫: পুষ্টি উন্নয়নে নারীর ভূমিকা
মানুষের মৌলিক অধিকার গুলোর প্রথম ও প্রধান অধিকার হচ্ছে অন্ন বা খাদ্য । আমাদের দেশে সাধারনতঃ পুরুষেরা অপ্রক্রিয়াজাত খাদ্য যোগায় এবং পরিবারে নারী খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । যেহেতু খাদ্যের সাথে পুষ্টি অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত তাই পুষ্টি উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য ও পুষ্টির অভাব পূরণে নারী সমাজের অবদানের বিষয় আমাদের ভেবে দেখতে হবে। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের পারিবারিক অন্যান্য কাজের সাথে ফসল, শাক সবজি ও ফলমূলের চাষ, পশু-পাখি পালন, খাদ্যতৈরী, পরিবেশ উন্নয়নে কাঠ ও অর্থকরী গাছের চাষ, ইত্যাদি কাজে মহিলারা সক্রিয় অর্থাৎ খাদদ্রব্য উৎপাদন থেকে খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে মহিলারা অংশগ্রহন করে থাকে। দেশের অধিক খাদ্য উৎপাদন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অপুষ্টি দূরীকরণে নারী কি অবদান রাখছে, অপুষ্টি দূরীকরনে সে আরও কি অবদান রাখতে পারে এই বিষয়গুলি এই মডিউলে বিশদভাবে বর্ননা করা হয়েছে।

মডিউল - ১৬: বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান
খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যের বিপরীতে- খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণের ছক এ মডিউলটিতে প্রদত্ত হয়েছে ।

মডিউল - ১
খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক ধারণা

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- খাদ্য ও পুষ্টির মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
- স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানা

ভূমিকা

মানুষকে কেন খাবার খেতে হয় ?

প্রতিটি মানুষকে সুস্থ, সক্রিয় ও অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল জীবন যাপন করার জন্য খাবার গ্রহণের প্রয়োজন হয় । নানারকম খাবার গ্রহণ করলে সক্রিয় থাকার শক্তি পাওয়া যায়, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে । দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রতিটি মানুষের খাওয়া উচিত। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন না হলে দেহে নানা রকম রোগ হতে পারে, এতে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, এমনকি মানুষ চলৎ শক্তিহীন হয়ে যেতে পারে। তাই স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝায় ও সু-স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে হবে ।

খাদ্য ও পুষ্টি

- **খাদ্যঃ** খাদ্য হল মানুষের দেহে গ্রহনযোগ্য কোন পদার্থ যা কাঁচা, তাজা, রান্না করা, বা প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় খাওয়া হয়। তবে ঔষধ এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। দেহকে সুস্থ রাখার জন্য এবং দেহের নিজস্ব কাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। আমরা সাধারনতঃ দৈনিক যে ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, তেল, সব্জি, ফল খাই এগুলি খাদ্য হিসেবে পরিচিত। এ খাদ্য গুলি নানা প্রকার রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান পাওয়া যায় যা শরীরের শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন এবং রোগ প্রতিরোধ করে। খাদ্যে গ্রহণের উদ্দেশ্য হল - (১) শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখা, (২) বয়স অনুযায়ী পর্যাপ্ত পুষ্টিমান নিশ্চিত করা, (৩) পুষ্টির অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ করা, (৪) সকল প্রকার পুষ্টি উপাদান গ্রহণ নিশ্চিত করা, (৫) শরীরকে নিরোগ রাখা এবং আয়ূ বৃদ্ধি করা।

- **পুষ্টিঃ** পুষ্টি হল খাদ্য গ্রহনের মাধ্যমে জীব দেহের একটি পরিচর্যা পদ্ধতি বা পুষ্টকরণ প্রক্রিয়া যা দ্বারা একটি জীব নিজেকে রক্ষনাবেক্ষণ ও বৃদ্ধি করে। জীব দেহের পরিচর্যা পদ্ধতি বা পুষ্টকরণ প্রক্রিয়াই পুষ্টি। খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়।
- **পুষ্টি বিদ্যা বা পুষ্টি বিজ্ঞানঃ** শরীর পুষ্টির যেসব উপাদানগুলি কিভাবে ব্যবহার করে সে বিষয়ে জানাই হল 'পুষ্টি বিদ্যা' বা পুষ্টি বিজ্ঞান'। খাদ্য কত প্রকারের হয়, আমাদের কি কি খাদ্য খেতে হবে, কতটুকু পরিমাণ খেতে হবে এবং খাদ্য কিভাবে শক্তি যোগায়, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে ও রোগ প্রতিরোধ কাজে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা পুষ্টি ও খাদ্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

- **পুষ্টি উপাদানঃ** যে সকল রাসায়নিক উপাদান দ্বারা খাদ্য গঠিত সে উপাদানগুলিকে পুষ্টি উপাদান বলে।

খাদ্য বা পুষ্টি উপাদান মূলতঃ ৬ (ছয়) টি। যেমন- ১। শর্করা, ২। তেল বা চর্বি, ৩। আমিষ, ৪। ভিটামিন, ৫। খনিজ লবন ও ৬। পানি। এ ৬ (ছয়) টি পুষ্টি উপাদানকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অনুযায়ী ২(দুই) ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- ১। মূখ্য বা মূল পুষ্টি উপাদান ২। গৌন পুষ্টি উপাদান। মূখ্য বা মূল পুষ্টি উপাদানগুলি আমাদের শরীরের জন্য বেশী পরিমাণে লাগে। গৌন পুষ্টি উপাদানগুলি আমাদের শরীরে কম পরিমাণে লাগে। কম পরিমাণে লাগলেও এসব পুষ্টি উপাদানের গুরুত্ব কিন্তু কম নয়।

ছক ১. পুষ্টি উপাদানের ভাগ

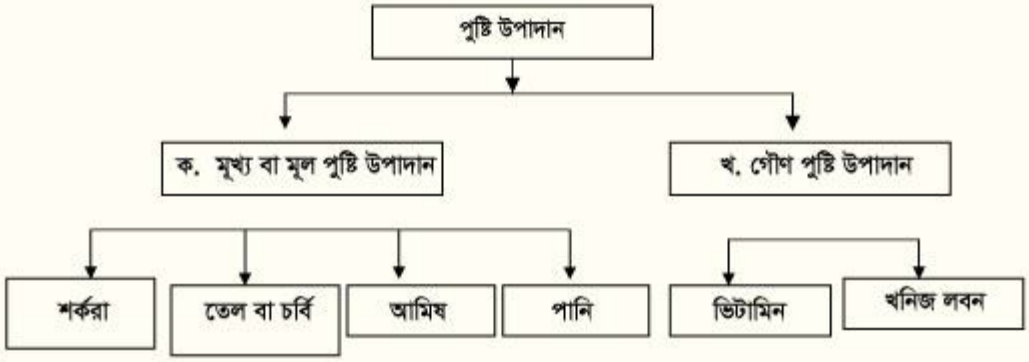

খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ

সাধারণতঃ কাজ অনুযায়ী খাদ্যকে ৩ (তিন) শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা:- (১) তাপ ও শক্তিদায়ক খাদ্য
(২) শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়-পূরণকারী খাদ্য
(৩) রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য।

ছক ২. কাজ অনুযায়ী খাদ্যের ভাগ

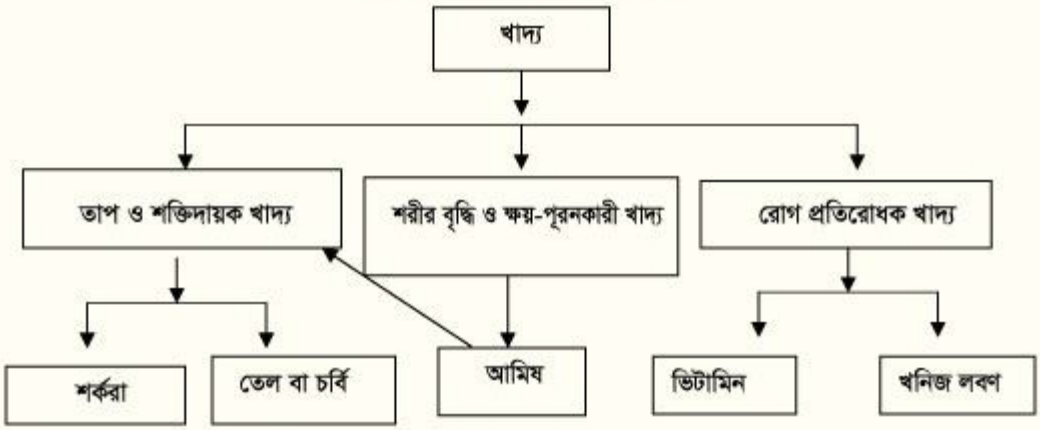

১। তাপ ও শক্তিদায়ক খাদ্য: কিছু খাদ্য আমাদের শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। এরা হল শর্করা এবং তেল বা চর্বি। প্রয়োজন হলে আমিষও আমাদের শরীরে তাপ ও শক্তি দেয়।

শর্করা জাতীয় খাদ্য- চাল,গম, ভূট্টা,আলু, মিষ্টি আলু, চিনি, গুড় শর্করা জাতীয় খাদ্য। শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখা, শরীরের বৃদ্ধি ও পেশী মেরামতের জন্য এরা শক্তি যোগায়। উদ্ভিজ তেল, প্রানীজ তেল, ঘি, চর্বি, মাখন,তেল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য। শরীরের বৃদ্ধি ও সু-স্বাস্থ্যের জন্য তেল বা চর্বি উৎকৃষ্ট উৎস। দেহে কিছু কিছু ভিটামিন শোষণের জন্য চর্বি সাহায্য করে থাকে।

২। শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়-পূরণকারী খাদ্য ঃ আমিষ জাতীয় খাদ্য শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়-পূরণকারী খাদ্য। প্রানীজ দুধ, মায়ের দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, সীমের বীচি, ডাল, মটরশুটি, সয়াবিন, ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্য। আমিষ জাতীয় খাদ্য দেহের কোষ তৈরী, দেহজ তরল, রোগ প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি ও অন্যান্য অংশ তৈরী এবং শক্তি উৎপাদন করে থাকে।

৩। রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য ঃ ভিটামিন ও খনিজ লবন রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য। ভিটামিন-এ, বি, এবং সি বিভিন্ন রোগ সংক্রামণ প্রতিরোধ করে ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কর্মক্ষম রাখে। ত্বক, চোখ ও ফুসফুস ভালো রাখে এবং অন্ত্রের আচ্ছাদনকে সুস্থ রাখে। এ ছাড়া এরা স্নায়ুতন্ত্রকে কাজ করতে সাহায্য করে। দেহে অপকারী অণু ধ্বংস করে ক্ষত সারিয়ে তুলে এবং লৌহ শোষনে সাহায্য করে। ভিটামিন- ডি মাংস পেশীর সুস্বাস্থ্য ও হাড় মজবুত করে। রোগ প্রতিরোধ শক্তি নিয়ন্ত্রণ, মাংস পেশী বৃদ্ধি ও ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। খনিজ পদার্থ যেমন - লৌহ, ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, জিঙ্ক ও ফোলেট দেহের শক্তি উৎপাদন, হাড়ের ক্ষয় রোধ, দেহের বৃদ্ধি, অক্সিজেন সরবরাহে সহায়তা, রক্ত কনিকা তৈরী, অস্থি গঠন, হরমোন তৈরী, ভ্রুনের অস্বাভাবিকতা রোধ ইত্যাদিতে সাহায্য করে। এছাড়া আমরা প্রচুর পরিমাণে পানি পান করে থাকি। আমাদের শরীরে তিন ভাগের দুই ভাগই পানি আছে। শরীরে পানির পরিমান কমে গেলে নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। এমনকি মৃত্যু ঘটে।

স্বাস্থ্য

"স্বাস্থ্য" বলতে মানব দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ বা জীবিত কোষ সমুহের বিপাক প্রক্রিয়ার কার্যকরী অবস্থা বুঝায়। এটা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত বা সামাজিক ক্ষমতা', যখন ব্যক্তি কোন শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক পরিবর্তন অনুভব করে বা পরিবর্তনের মুখোমুখি হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৪৮ সনের কন্সটিটিউসনে "স্বাস্থ্য" কে এভাবে বর্ননা করেছে যে,এটা হল একজন মানুষের পুরোপুরি শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক ভালো অবস্থা যা শুধুমাত্র রোগের অনুপস্থিতি নয়, এর সাথে নিজস্ব তৃপ্তি বা আত্মতৃপ্তি জড়িত। 'স্বাস্থ্য সেবা' প্রবর্তণকারী সংস্থা মানুষের 'স্বাস্থ্য সমস্যা' প্রতিরোধ বা প্রতিকারের জন্য ভাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পর্যায়ক্রমিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করে। স্বাস্থ্য রক্ষা সেবা শুধু মানুষের জন্যই নয়, প্রাণী ও পশু-পাখির জন্যও দেয়া হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি বা স্বাস্থ্য সেবা একজনের নিজ পরিবেশ ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত (যা একজনের স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে) হয়, যেমন মানুষের পূর্বাবস্থা, জীবন নির্বাহ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থা। এগুলোকে স্বাস্থ্যের নির্ধারক অবস্থা বুঝায়। এমনও দেখা গেছে যে, প্রচন্ড চাপ মানুষের স্বাস্থ্যের সমস্যা করে। মানুষ যেখানে বসবাস করে সে অবস্থাও স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া জীবন নির্বাহের ধরণ বা রীতি (লাইফ স্টাইল), জীবন ধারনের মূল্যায়ন, গোষ্ঠী (ক্লাশ/ শ্রেনী,) ধর্মীয় অবস্থাও স্বাস্থ্য অবস্থা নির্ধারণ করে।

স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতি শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অগ্রসরতা ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না। কিছু কার্যকরী প্রচেষ্টা নেয়া, বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন নির্বাহ বুঝে নেয়া বা গ্রহনের মাধ্যমে ব্যক্তি বা সমাজের স্বাস্থ্য উন্নতি হয়। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাস্থ্যের জন্য প্রধান নির্ধারক বা মূল উপাদান গুলি হল জনগণের, অর্থনৈতিক, শারীরিক, শিক্ষাগত ও কর্ম ব্যবস্থা, নিজস্ব স্বাস্থ্য অনুশীলন এবং দক্ষতা আয়ত্ত করা, স্বাস্থ্যবান শিশু গড়ে তোলা, জীব ও জেনেটিক্স, সংস্কৃতি, সামাজিক পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সর্তকতা সেবা । বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার রিপোর্টে ভাল স্বাস্থ্যের সাথে জীবন রীতি ও অন্যান্য নির্ধারকগুলোর যোগসুত্র আছে বলে বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্যকে সুস্বাস্থ্যে ধরে রাখা বা স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এ নির্ধারকগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্জন সম্ভব। স্বাস্থ্য শুধুমাত্র দেহের বেঁচে থাকার একটি অবস্থা বা উদ্দেশ্য নয়, এটি একটি হ্যাঁ বাচক ধারণা যাতে ব্যক্তিগত শারীরিক উন্নতি বা সংরক্ষণ হয় অথবা বলা যায় 'স্বাস্থ্য' জীবনের একটি শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় অবস্থা, প্রধানত যা রোগ ও ব্যথা থেকে মুক্ত নয়।

মডিউল -২
মূখ্য বা মূল পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- মূখ্য বা মূল পুষ্টি উপাদানের সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
- মূল পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পর্কে জানা

ভূমিকা

দেহের জন্য অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান সমূহ

সকল খাদ্যেই বিভিন্ন মাত্রার পুষ্টি উপাদান থাকে। যে কোন একটি খাদ্য শরীরের স্বাভাবিক কাজ কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে পারে না। প্রত্যেক পুষ্টি উপাদানের নির্দিষ্ট কাজ আছে এবং কাজে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। সে জন্য শরীরের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের মান বজায় রাখতে প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণ দরকার।

মূখ্য বা মূল পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমান

বিশ্বে বিভিন্ন উপায়ে খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। আমাদের দৈনিক খাবারের মূল অংশ শস্য প্রধান। মূখ্য বা মূল খাদ্য হল সস্তা খাদ্য, যাতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার, আমিষ, কিছু অনু পুষ্টি (বিশেষত কিছু বি-গ্রুপ ভিটামিন) এবং খাদ্য আঁশ আছে।

খাদ্যের মূখ্য বা মূল উপাদান প্রধানত ৪টি ভাগে বিভক্ত, যেমন ১. শর্করা, ২. আমিষ, ৩. তেল/ চর্বি ও ৪. পানি।

নিম্নে খাদ্যের মূখ্য বা মূল উপাদানগুলির কাজ, উৎস ও মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ বর্ননা করা হল--

শর্করা

কাজ

শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে;
চর্বি/তৈল জাতীয় পদার্থ দহনে সাহায্য করে;
আমিষের প্রধান কাজ করতে সহায়তা করে;
কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করে।

উৎস

চাল, গম, ভূট্টা, চিনি, গুড়, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য, গোল আলু, মিষ্টি আলু, কচু ইত্যাদি।

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমান (আহারোপযোগী)

- মোট প্রয়োজনীয় খাদ্য শক্তির ৫০-৭০ ভাগ।

আমিষ বা প্রোটিন

কাজ

- দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করে;
- দেহের ক্ষয় পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে;
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে;
- শরীরে তাপশক্তি সরবরাহ করে;
- শরীরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

উৎস

- প্রানীজ উৎস যেমন-মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, কলিজা এবং
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- ডাল, বাদাম, মটরশুঁটি, সীম বা কাঁঠালের বীচি, চাল, গম ও ভূট্টা।

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমান (আহারোপযোগী)

- প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য ১ গ্রাম (পূর্ণ বয়স্কদের জন্য)
- প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য ২-৩ গ্রাম (৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জন্য)
- প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য ১.৭ গ্রাম (৪-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত)
- প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য ১.৫ গ্রাম (গর্ভবতী ও প্রসূতির জন্য)।

তৈল বা চর্বি/ফ্যাট

কাজ

- দেহে শক্তি সরবরাহ করে;
- দেহের ত্বককে মসৃণ রাখে; এবং
- খাবার সুস্বাদু করে ও চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনকে শরীরের কাজে লাগাতে সাহায্য করে।

উৎস

- প্রাণীজ উৎস যেমন- ঘি, মাখন, চর্বি এবং
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন-সয়াবিন তেল, সরিষার তেল, তিলের তেল, সূর্যমুখীর তেল, ডালডা, নারিকেল।

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ (আহারোপযোগী)

- প্রায় ৩৫-৪০ গ্রাম (পূর্ণ বয়স্কের জন্য)
- প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য দৈনিক ২-৩ গ্রাম (১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জন্য)।

পানি

কাজ

- মানব দেহে যে কোন রাসায়নিক পরিবর্তনে সাহায্য করা;
- গ্রহণকৃত খাবার হজম, বিশোষণ বা আত্মভূতকরণ, সংগ্রহণ ও মল নিঃসারণ;
- শরীরে তাপমাত্রা রক্ষা;
- অত্যধিক গরমে শ্বসন এর মাধ্যমে শরীরকে ঠান্ডা রাখা;
- শরীরে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পুষ্টি উপাদান পৌছানো;
- শরীরের জোড়া অংশ নড়াচড়ায় সাহায্য করা এবং
- শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বের করে দেয়া

উৎস

- তরল খাবার বা পানীয়,
- শক্ত খাবার এবং
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত বিশুদ্ধ পানি

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

- প্রায় আড়াই থেকে তিন লিটার (পূর্ণ বয়স্কের জন্য)

মডিউল - ৩
গৌণ পুষ্টি বা অনু পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- গৌণ পুষ্টি বা অনু পুষ্টি উপাদানর সম্পর্কে ধারনা লাভ করা
- গৌণ পুষ্টি বা অনু পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমান সম্পর্কে জানা

ভূমিকা

খাদ্যের গৌণ পুষ্টি উপাদানকে অনু পুষ্টিও বলা হয়। গৌণ পুষ্টি উপাদানকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:-

১. খনিজ পদার্থ বা খনিজ লবণ এবং

২. খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ।

দেহে গৌণ পুষ্টি উপাদান খুব কম পরিমাণে দরকার হয়। এদের মিলিগ্রাম বা মাইক্রোগ্রাম হিসেবে মাপা হয়। এসব গৌণ পুষ্টি উপাদানের অভাবে মূল বা মুখ্য পুষ্টি উপাদান অনেক সময় শরীরে কাজে লাগে না। এর অভাবে মানব দেহে গৌণ পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত অপুষ্টি দেখা দেয়। আমরা গৌণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণের উপর বেশী গুরুত্ব দিই না। অথচ বাংলাদেশে গৌণ পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগগুলোই বেশী দেখা যায়।

নিম্নে খাদ্যের গৌণ পুষ্টি উপাদানগুলির কাজ, উৎস ও মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ বর্ননা করা হল-

ক্যাল্‌সিয়াম

কাজ

- ভিটামিন-ডি ও ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফরাসের সহযোগীতায় শরীরের অস্থি, হাড় ও দাঁত গঠন এবং মজবুত করে;
- প্রতিটি জীব কোষ গঠনে এর প্রয়োজন;
- রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদান ও
- হৃৎপিন্ডের সংকোচন, প্রসারণ এবং হৃৎপিন্ডের স্পন্দনে সাহায্য করে।

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন- ছোট চিংড়ি, ছোট মাছের কাঁটা, নরম হাড়, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার এবং
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- ডাল, ঢেঁড়স, সজনে এবং সবুজ শাক যেমন- কচু শাক, লাল শাক, পালং শাক ইত্যাদি।

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমান

- ৪৫০ মিলিগ্রাম (প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য)
- ৫০০-৬০০ মিলিগ্রাম (শিশুর জন্য)
- ৬৫০ মিলিগ্রাম (কিশোর কিশোরীর জন্য)
- ১১০০ মিলিগ্রাম (গর্ভবতীর জন্য)
- ১১০০ মিলিগ্রাম (প্রসূতির জন্য)।

ফস্‌ফরাস

কাজ

- ক্যালসিয়ামের সাথে মিলিত হয়ে হাড় ও দাঁতের তন্তু তৈরী এবং মজবুত করে;
- শর্করা এবং চর্বি বিপাকে সাহায্যের মাধ্যমে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে এবং
- কোষের নিউক্লিক এসিড ও সাইটোপ্লাজমের অপরিহার্য অংশ।

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনির ও
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- বাদাম, ডাল এবং দানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য ।

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

- ৮০০ মিলিগ্রাম।

পটাশিয়াম

কাজ

- দেহের বৃদ্ধি বিশেষ করে চর্বিহীন মাংসপেশী বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।
- পেশীর স্বাভাবিক নড়াচড়া বজায় রাখে।

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন-চর্বিহীন মাংস এবং দুধ তবে কম-বেশী প্রায়
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- ডাবের পানি, এছাড়াও সব খাবারের মধ্যে পটাশিয়াম রয়েছে।

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

- ২.৫ মিলিগ্রাম (প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য)

লৌহ বা আয়রন

কাজ

- রক্তে হিমোগ্লোবিনের হিম তৈরীর জন্য অপরিহার্য;
- কোষ কলায় অক্সিজেন পৌঁছে দেয়;
- অসংখ্য এনজাইমের অংশ হিসেবে অক্সিডেশন-রিডাকশন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং
- জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন-ট্রান্সফার সিস্টেমের জন্যে লৌহের প্রয়োজন।

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন-মাংস, কলিজা, ডিম, টেংরা, তাপসী, মাছের শুঁটকি
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- কাঁচা আম, আমচুর, কালো কচুশাক, ফুলকপির পাতা, শালগম পাতা, ডাঁটা শাক এবং অন্যান্য শাক।

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

- ১০ মিলিগ্রাম (ছোট ছেলে মেয়ের জন্য)
- ১৮ মিলিগ্রাম (কিশোরের জন্য)
- ২৪ মিলিগ্রাম (কিশোরীর জন্য)
- ৯ মিলিগ্রাম (প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য)
- ২৮ মিলিগ্রাম (প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার জন্য)
- ৩৩ মিলিগ্রাম (গর্ভবতীর জন্য)

আয়োডিন

কাজ

- থাইরক্সিন নামক হরমোন তৈরীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং
- শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন- সামুদ্রিক মাছ (তাজা / শুঁটকি)
- প্রাকৃতিক উৎস যেমন- সামুদ্রিক আগাছা।
- আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ।

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

- ১৫০ মাইক্রোগ্রাম ।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রান

ভিটামিনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) তৈল বা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন-ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-ই, ভিটামিন-কে
(২) পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন, যেমন- ভিটামিন- বি এবং ভিটামিন- সি

নিচের ছকে ভিটামিনের ভাগ দেখানো হলঃ

ছক ৩. ভিটামিনের ভাগ

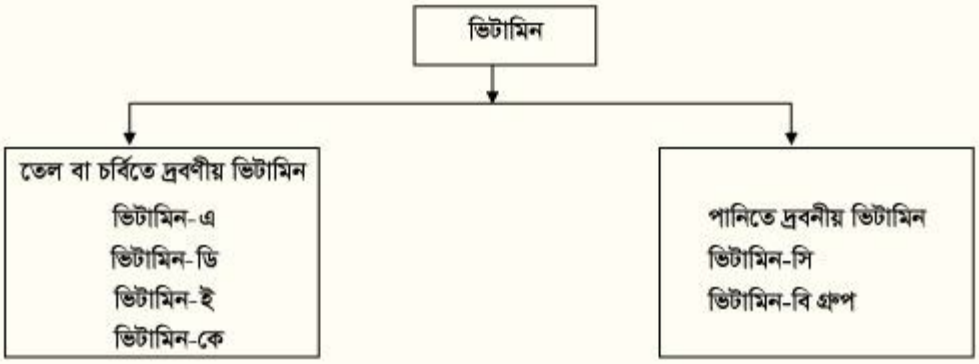

নিম্নে ভিটামিনের কাজ, উৎস ও মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ দেয়া হল

তৈল বা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন-এ

কাজ

- চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখে;
- ত্বকের কোষকে ভালো রাখে ফলে ত্বক মসৃণ থাকে;
- দৈহিক গঠন এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করে;
- হাড় ও দাঁত তৈরীতে সহায়তা করে;
- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও
- প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করে।

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন- ফিশ লিভার অয়েল, মাছের তেল, কলিজা, মাখন, ডিমের কুসুম, কিড্‌নী, চর্বি এবং
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- রঙিন/গাঢ় রংয়ের শাক-সব্‌জি, ফল এবং ভূট্টা ও মিষ্টি আলু।

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

- প্রায় ৫০০০ আই ইউ (প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য)
- প্রায় ৫০০০ আই ইউ (গর্ভবতীর জন্য)
- প্রায় ৫০০০ আই ইউ (প্রসূতির জন্য)
- প্রায় ২০০০-৪৫০০ আই ইউ (১-১২ বছর বয়স পর্যন্ত)

ভিটামিন-ডি

কাজ

- শরীরে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের বিপাকে সাহায্য করে এবং
- হাড় ও দাঁত গঠন ও মজবুত করে

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন- মাছের তেল, ফিশ লিভার অয়েল, মাখন, ডিমের কুসুম, দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার এবং
- উদ্ভিজ্জ খাদ্য: ভিটামিন-ডি নেই
- প্রাকৃতিক উৎস যেমন- সূর্যের আলো

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

- ২.৫ মাইক্রোগ্রাম (প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য)
- ১০ মাইক্রোগ্রাম (গর্ভবতী, প্রসূতি ও শিশুর জন্য)

ভিটামিন-ই

কাজ

- এন্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে ভিটামিন-এ, ক্যারোটিন এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডকে জারিত হয়ে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং
- প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ বন্ধ্যাত্ব নিবারণে সহায়তা করে

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন- কডলিভার অয়েল এবং
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- বাদাম, গম, যব, সূর্যমুখী তেল, সয়াবিন তেল এবং পাম তেল এবং কচি ভুট্টা

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

প্রায় ৫-১০ মিলিগ্রাম

ভিটামিন কে

কাজ

- তাড়াতাড়ি রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে
- দ্রুত রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে এবং
- কলিজার মধ্যে প্রোথ্রোম্বিন উৎপাদনে সাহায্য করে

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন- ডিমের কুসুম ও গরুর কলিজা এবং
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- সবুজ শাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লেটুস পাতা ও পালং শাক

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

প্রায় ৪০ মাইক্রোগ্রাম (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য)।

পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন

ভিটামিন-সি

কাজ

- কোলাজেন নামক আমিষ তৈরী এবং রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করে
- চর্বি, আমিষ এবং এমাইনো এসিড বিপাকে সাহায্য করে
- রক্ত তৈরী করার জন্য লৌহ এবং তামাকে ব্যবহৃত হতে সাহায্য করে
- চামড়া মসৃণ এবং উজ্জ্বল রাখে
- দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখে এবং
- ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি শুকাতে সাহায্য করে
- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে

উৎস (আহারোপযোগী)

- আমলকী, পেয়ারা, জাম্বুরা, লেবু, কমলা, আমড়া. কুল. আনারস. কামরাঙা, আম, কালো জাম, টমেটো, কাঁচা মরিচ, অঙ্কুরিত ছোলা, লেটুস পাতা, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা এবং অন্যান্য সবুজ শাক-সব্জি

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমান

- ২০ মিলিগ্রাম (শিশুর জন্য)
- ৩০ মিলিগ্রাম (প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য)
- ৫০ মিলিগ্রাম (গর্ভবতীর জন্য)
- ৫০ মিলিগ্রাম (প্রসূতির জন্য)

রাইবোফ্লাভিন বা ভিটামিন-বি$_২$

কাজ

- শরীরে শর্করা, আমিষ এবং চর্বি জাতীয় খাদ্যের বিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে শক্তি উৎপাদন করতে সাহায্য করে এবং
- শরীর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন- দুধ, ডিম, কলিজা, মাছ, মাংস এবং
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- ঢেঁকি-ছাঁটা সিদ্ধ চাল, ডাল, বাদাম, সবুজ শাক সব্জি ও ফল

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

১.৫ মিলিগ্রাম (পুরুষের জন্য)
১.১ মিলিগ্রাম (মহিলার জন্য)
১.৩ মিলিগ্রাম (গর্ভবতীর জন্য)
১.৫ মিলিগ্রাম (প্রসূতির জন্য)

থায়ামিন বা ভিটামিন-বি$_১$

কাজ

- শরীরে শর্করা জাতীয় খাদ্য বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করে;
- চর্বি ও আমিষ থেকে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে এবং
- দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করে
- স্নায়ুতন্ত্রকে কাজ করতে সাহায্য কর।

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন- চর্বিহীন মাংস, কলিজা, ডিম, দুধ,মাছ, এবং
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- ঢেঁকি-ছাঁটা সিদ্ধ চাল, ডাল, গম, যব, ঈস্ট, মটরশুঁটি ইত্যাদি

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

- ১.৪ মিলিগ্রাম (পুরুষের জন্য)
- ১.০ মিলিগ্রাম (মহিলার জন্য)
- ১.১ মিলিগ্রাম (গর্ভবতীর জন্য)
- ১.৪ মিলিগ্রাম (প্রসূতির জন্য)

নায়াসিন

কাজ

- কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে সাহায্য করে এবং
- কার্বোহাইড্রেট ও আমিষ থেকে দেহের চর্বি উৎপাদনে সাহায্য করে

উৎস (আহারোপযোগী)

- প্রানীজ উৎস যেমন- মাংস, কলিজা এবং
- উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন- গম, ডাল, বাদাম, তেল বীজ, ছোলা ও শাক-সব্জি

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ

- ১৮.২ মিলিগ্রাম (পুরুষের জন্য)
- ১৩.২ মিলিগ্রাম (মহিলার জন্য)

- ১৫.১ মিলিগ্রাম (গর্ভবতীর জন্য)
- ১৮.১ মিলিগ্রাম (প্রসূতির জন্য)

ভিটামিন বি$_{১২}$

কাজ
- কো-এনজাইম হিসেবে দেহে কাজ করে এবং
- রক্তের লোহিত কণিকার আকার স্বাভাবিক রাখে।

উৎস (আহারোপযোগী)
- প্রানীজ উৎস যেমন- কলিজা, মগজ, হৃৎপিন্ড, কিডনী, মাংস, মাছ, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য, ডিমের কুসুম ও গরুর কলিজা
- উদ্ভিজ্জ খাদ্যে ভিটামিন বি$_{১২}$ নেই

মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ
- ১.০ মাইক্রোগ্রাম (শিশুর জন্য)
- ২.০ মাইক্রোগ্রাম (প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য)
- ৩.০ মাইক্রোগ্রাম (গর্ভবতীর জন্য)
- ২.৫ মাইক্রোগ্রাম (প্রসূতির জন্য)

মডিউল - ৪
সুষম খাবার

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য
- সুষম খাবার কি সে সম্পর্কে জানা
- মৌলিক খাদ্যশ্রেণী কি কি সেগুলো সম্পর্কে জানা
- খাদ্যশ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত খাদ্য যা সুষম খাবার তৈরী করে সে সম্বন্ধে জানা

ভূমিকা

আমাদের পেটে খাবার না থাকলে আমরা ক্ষুধা অনুভব করি এবং খাবার খেলেই ক্ষুধা নিবারণ হয়। যতবার ক্ষুধা লাগে ততবারই আমরা কিছু না কিছু খাই। কিন্তু খাওয়ার উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধা নিবারণ বা পেট ভরা নয়। খাবার গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হল আমাদের শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ, কর্মশক্তি যোগান এবং রোগ প্রতিরোধ করা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে খাবার খাওয়া সত্ত্বেও আমাদের শরীর ঠিকমত বৃদ্ধি ও শক্তি পাচ্ছে না। এর কারণ অমরা শরীরে ঠিকমত পুষ্টি পাচ্ছি না। তাই আমাদের দৈনিক খাদ্য এমন হওয়া উচিত যেন ঐ খাদ্য শরীরে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সব কয়টি পুষ্টি উপাদান যোগান দিতে পারে।

সুষম খাদ্য কি ও কিভাবে তৈরী করতে হয়

যে খাদ্যে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব কয়টি পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণে থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়- সুষম খাদ্য বলতে ঐ পরিমাণ খাদ্যকে বুঝতে হবে যা কোনো ব্যক্তির বয়স, পেশা, জেন্ডার ও শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি অনুসারে দৈনিক প্রয়োজনীয় সবগুলো উপাদান সঠিক পরিমাণে যোগান দিতে পারে। তাছাড়া ঐ খাদ্য রুচিসম্মত ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং এর মধ্যে কিছু পরিমাণ আঁশ জাতীয় খাবারও থাকতে হবে। সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। অর্থাৎ একটি সুষম খাবার হল একটি পরিপুর্ণ খাদ্য যা-
- শারীরিক কাজ যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য পরিপাক, এবং রক্ত সঞ্চালনসহ পেশাগত কাজ ও শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়।
- শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়-পূরণ করে
- অসুস্থতা প্রতিরোধ করে

সুষম খাদ্য পেতে হলে কাজ অনুযায়ী তিন শ্রেণীর খাদ্যের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এই তিন শ্রেণী হল-
- শক্তিদায়ক খাদ্য
- বৃদ্ধি কারক খাদ্য
- রোগ প্রতিরোধক খাদ্য

সুষম খাদ্য তৈরী করতে তাপ ও শক্তিদায়ক, শরীর গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়-পূরক এবং রোগ প্রতিরোধক খাদ্যসমূহ থেকে কোন না কোনটা অবশ্যই বেছে নিতে হবে। সুষম খাদ্য বলতে শুধু দামী খাদ্যকেই বুঝায় না,সস্তা খাদ্য সামগ্রী দিয়েও সুষম খাদ্য তৈরী করা যায় এবং তা করতে হলে বিশেষ করে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর পুষ্টিমান জানা আবশ্যক। শিশুর জন্ম থেকে ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধই যথেষ্ট যা শিশুর সকল পুষ্টি চাহিদা মিটাতে পারে। ৬ মাস হলে মায়ের দুধের সাথে সাথে সম্পূরক খাবার দিতে হবে।

সুষম খাদ্য গঠনকারী তিন ধরনের খাদ্যশ্রেনী হল-

১.শক্তিদায়ক খাদ্য

শারীরিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা এবং শিশুর বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে শক্তিদায়ক খাদ্য । শস্য-দানা, মূল, কন্দ জাতীয় শর্করা সমৃদ্ধ খাদ্য এবং তেল, ঘি ও মাখন শক্তিদায়ক খাদ্যশ্রেনীর অর্ন্তভূক্ত।

নিচের ছকে শক্তিদায়ক কিছু খাদ্যের উৎস দেয়া হলঃ

ছক ৪. শক্তিদায়ক খাদ্য সমুহ

খাদ্য শস্য	মূল ও কন্দ	স্নেহ (ফ্যাট) ও মিষ্টি
চাল	গোল আলু	তেল
গম	মিষ্টি আলু	ঘি
বাজরা	শালগম	মাখন
ভূট্টা	মেটে আলু	চিনি
যব / সাগুদানা	বীচি	গুড়
চিড়া		নারিকেল
সুজি		

২. দেহ গঠনকারী খাদ্য

আমিষযুক্ত খাদ্য যা কোষ ও কলা তৈরী এবং রক্ষা করে তা এই শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে পড়ে। আমরা প্রতিদিন যে কাজ-কর্ম করি তাতে প্রচুর শক্তি এবং কোষ ও কলার ক্ষয়-সাধন হয়। দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়-পূরণের জন্য নতুন কোষ তৈরীতে আমিষ জাতীয় খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে তাই একে দেহ গঠনকারী খাদ্য বলে। আমিষ দেহে শক্তি, ভিটামিন-এ, ভিটামিন - বি গ্রুপ এবং কিছু খনিজ (যেমন লৌহ) সরবরাহ করে। এই শ্রেনীর খাদ্য হল ডাল, শুঁটি, বাদাম, তেলবীজ ও মাছ, মাংস, দুধ জাতীয় খাবার। নিচের ছকে দেশীয় কিছু দেহ গঠনকারী খাদ্যের তালিকা দেয়া হল।

ছক ৫. দেহ গঠনকারী খাদ্য সমুহ

ডাল ও শুটি	বাদাম ও তেলবীজ	দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য	মাংস
মুগ	চীনা বাদাম	দুধ	গরুর মাংস
মসুর	পেস্তা বাদাম	দৈ	খাসীর মাংস
মাষকলাই	কাজু বাদাম	ঘি	মুরগীর মাংস
ছোলার ডাল	মিষ্টি কুমড়ার বীচি	পনির	ডিম
খেসারীর ডাল	তিল	মাখন	মাছ
অরহড় ডাল			

৩. রোগ প্রতিরোধী /প্রতিরোধকারী খাদ্য

যে খাদ্যগুলি মূলতঃ দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেহকে অসুস্থতার হাত হতে রক্ষা করে এবং দেহের কর্ম ক্ষমতা রক্ষা করতে সাহায্য করে সেগুলি রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য। অনুপুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল রোগ প্রতিরোধী খাদ্য। অনুপুষ্টির

পরিমাণ নির্ভর করে ফল ও শাক-সব্জির প্রকারভেদের উপর। ভিটামিন এ ও সি যুক্ত ফল এবং শাক-সব্জিতে প্রচুর পরিমানে বিভিন্ন ধরণের উপাদান থাকে যা এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। প্রতিদিন প্রচুর পরিমানে অনুপুষ্টি পাওয়ার সবচেয়ে ভাল উপায় হল প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ১০০ গ্রাম ফল ও ৩০০ গ্রাম শাক-সব্জি খাওয়া। নিচের ছকে রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্যের তালিকা দেয়া হল।

ছক ৬. রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য সমূহ

সব্জি	ফল	শাক পাতা
টমেটো	আম	লাল শাক
গাজর	পেঁপে	পুঁই শাক
বেগুন	আনারস	পালং শাক
পটল	আমলকী	মেথি শাক
চিচিঙ্গা	তরমুজ	সজনে শাক
মিষ্টি কুমড়া	কলা	নটে শাক
চাল কুমড়া	জামরুল	সরষে শাক
ফুলকপি	জাম	মূলা শাক
বরবটি	লিচু	ফুলকপির ডাটা
ঢেঁড়স	সফেদা	কচু শাক
সীম	বেল	ডাটা শাক
লাউ	পেয়ারা	বাঁধাকপি
ঝিংগা	কমলা	পুদিনা শাক

সূত্রঃ খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি ম্যানুয়াল, ইউএস এইড ও এফএও, ২০১৫

আমাদের প্রতিদিনের খাবারে তিনটি খাদ্যশ্রেনী থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বেশীর ভাগ মানুষ শস্য-দানা চাল (ভাত) কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এর ফলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যেমন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের ঘাটতি দেখা যায় এবং বিভিন্ন অনুপুষ্টির অভাবজনতি রোগে ভুগে। দৈনন্দিন বিভিন্ন খাবার যেমন প্রানীজ খাদ্য, ফল-মুল, শাক-সব্জি গ্রহনের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা যায়। এদেশে জনগন সাধারণতঃ প্রত্যহ তিন বার মূল খাবার এবং দুইবার নাস্তা গ্রহণ করে। এ খাবারগুলি বিভিন্ন খাদ্যশ্রেণীর ও বিভিন্ন খাদ্যের সমন্বয়ে তৈরী করা দরকার যাতে পরিবারের প্রতিটি সদস্য তার প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি উপাদান পেতে পারে। তিন শ্রেনীর খাদ্যের সমন্বয়ে একটি সুষম খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। শ্রেনীগুলো হলঃ-

- শস্য-দানা, মূল বা কন্দ ও নারিকেল
- ডাল, বাদাম বা তেলবীজ ও নারিকেল
- একটি সব্জি বা ফল

নিচের ছকে তিনটি খাদ্য শ্রেনী সমন্বয়ে সুষম খাদ্য তৈরীর তালিকা দেয়া হল।

ছক ৭. তিনটি খাদ্য শ্রেনীর সমন্বয়ে সুষম খাদ্য তৈরির তালিকা

শক্তি দানকারী খাদ্য	দেহ গঠনকারী খাদ্য	রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য	চুড়ান্ত খাবার
চাল	ডাল	পালং শাক	পুষ্টিকর খিচুড়ী
চাল	ডাল+ডিম/মাছ/মাংস	শাক সব্জি	ডিম /মাছ/ মাংস/ খিচুড়ী
চালের গুড়া + নারিকেল	মুগডাল	হলুদ কমলা সব্জি	চালের বড়া/ পিঠা
ময়দা	বেসন	ঘন সবুজ শাক সব্জি	পুষ্টিকর রুটি
গমের আটা + গুড়	বেসন+ চীনাবাদাম	গাজর + লাউ	লাড্ডু
মুড়ি+ গোল আলু	ছোলাভাজা+ চীনাবাদাম	গাজর + টমেটো + পিয়াঁজ + কাঁচামরিচ	ঝালমুড়ি
চিড়া	ভিজানো মুগ+ চীনাবাদাম	গাজর+টমেটো+ধনে পাতা	চিড়া উপমা
চিড়া + গোল আলু	ছোলাভাজা+ চীনাবাদাম	গাজর+টমেটো+পিঁয়াজ+ কাঁচামরিচ	পুষ্টিকর চিড়া

রুটি + চিনি	দুধ	কলা/আম/পেঁপে	দুধ রুটি
চাল	দুধ	কলা	দুধ ভাত
চাল	মাছ	পেঁপে+ ঘন সবুজ পাতা জাতীয় শাক-সব্জি	মাছ ভাত
রুটি	মাছ	শাক-সব্জি	মাছ রুটি
গমের আটা	বেসন + ডিম	পিঁয়াজ+ বাঁধাকপি	পুষ্টিকর অমলেট
গমের আটা চালের গুড়া	বেসন	শাক-সব্জি	নিরামিষ অমলেট
গোল আলু	ডিম	কাচাঁপেঁপে+পটল+লাউডগা+মিষ্টি কুমড়া+ বড় (মৌ) সীম+পাতাজাতীয় শাক-সব্জি (পুই ও লাল শাক)	মিশ্র সব্জি ও ডিমের ঝোল
চাল	ডাল + সিমের বীচি +ডিম	পাতা জাতীয় শাক-সব্জি/ সজনে শাক/ টমেটো	সবুজ ভাত
ময়দা	ডিম	সজনে শাক + টমেটো+ ধনে পাতা	সজনে শাকের অমলেট
গোল আলু	ডাল মিশ্রিত রুটি	শাক-সব্জি (পিঁয়াজ+ টমেটো + পালংশাক	ডাল সব্জি রুটি
সঠিক মাত্রায় তেল ব্যবহার করে ও আয়োডিনযুক্ত লবণ সহযোগে খাবার তৈরী করতে হবে। সূত্রঃ খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি ম্যানুয়াল, ইউএসএইড ও এফএও,২০১৫			

খাদ্য সমন্বয়

- আহারে প্রতিদিন নানা খাদ্যশ্রেণীকে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। যেহেতু শস্য-দানা ও ডালে অধিকাংশ পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় না তাই সবুজ শাক ও অন্যান্য শাক-সব্জি ও ফলের সাথে এদের সংমিশ্রণ করলে ভাল হয়।
- শস্য-দানা, ডাল ও সবুজ সব্জি যথাক্রমে ৩:১:২ অনুপাতে মিশানো যেতে পারে।
- চিনি, গুড়, তেল ও বাদাম যোগ করলে শক্তির ঘাটতি কিছু মিটতে পারে।
- পিঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা-মরিচ, গোলমরিচ, ইত্যাদি দেশীয় মশ্‌লা যোগ করলে খাদ্য সুস্বাদু হয়।
- হলুদ ও কমলা রংয়ের সব্জির এবং সবুজশাক এর সাথে সামান্য মাছ/ মাংস/ ডিম (৩০ গ্রাম) যোগ করলে খাবারের গুনগত মান বৃদ্ধি এবং লৌহ সহজে পাওয়া যায়।
- ঘন সবুজ শাক সব্জির সাথে দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার যোগ করলে খাবারের পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায় এবং উচ্চমানের আমিষ, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন যুক্ত হয়।

খাদ্যের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করতে শস্য-দানা, শাক-সব্জির মিশ্রনে যে নতুন খাবার প্রস্তুত করা যায়, নীচে তা দেখানো হল

- সমপরিমান মুগ, ছোলা ও মাষকলাই ডাল পরিমানমত পানিতে চার ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভালো করে ধুয়ে কাটা ঘন সবুজ শাক-সব্জি এতে যোগ করতে হবে। এগুলি এক সাথে বেটে নিয়ে লবন ও মশ্‌লা মিশিয়ে মন্ড তৈরী করে এই মন্ড থেকে পিঠা তৈরী করে পুষ্টিকর নাস্তা হিসাবে খাওয়া যায়।

- সমপরিমান চালের গুঁড়ো, গমের আটা ও বেসন মিশিয়ে রুটি প্রস্তুত করে খাওয়া যেতে পারে। রুটির মন্ড তৈরীর সময় এতে ঘন সবুজ শাক-সবজি দেওয়া যেতে পারে।

অঙ্কুরিত ডাল-শস্য ব্যবহার করুন

- সমপরিমান মুগ, ছোলা এবং অন্যান্য সহজ লভ্য গোটা ডাল ও কড়াইশুটি ৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- এরপর একটি ভিজা পাতলা কাপড়ে ১২ ঘন্টা বেঁধে রাখলে এগুলো অঙ্কুরিত হবে।
- এগুলিকে গোল আলু, টমেটো ও শাক-সব্জি দিয়ে ঘুগ্‌নী হিসেবে অথবা ভাত বা রুটির সাথে খাওয়া যেতে পারে।

সঠিক গেঁজিয়ে ওঠা খাদ্য ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরী করুন

- এক বা দুই ভাগ চাল এবং তিন ভাগ মাষকলাই ডাল একসাথে মিশিয়ে মিশ্রনটি ছয় ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর মিশ্রনটি বেঁটে নিয়ে ১২ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। মিশ্রণটি

গেঁজিয়ে উঠবে। গেঁজিয়ে উঠা মিশ্রনটি তে বাঁধাকপি, পালং শাকের কুচি মিশিয়ে একটি ধাতব পাত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর এটি ভাপিয়ে নিতে হবে। তৈরী হওয়া খাবারটি সুস্বাদু নাস্তা হিসেবে খাওয়া যায়।

- মাষকলাই ডাল ৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভালোভাবে বেঁটে এক চিমটি লবন, জিরা ও কাঁচা মরিচ মিশিয়ে ৮ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। গেঁজিয়ে উঠা মিশ্রনটি দিয়ে ছোট ছোট বড়ি তৈরী করে ২-৮ দিন রোদে শুকাতে হবে। ডাল ও সব্জি রান্নায় এগুলি দেয়া যায় যা আহারে পুষ্টিমূল্য, বৈচিত্র এবং স্বাদ যোগায়।
- দুধ গাঁজানো পদ্ধতিতে তৈরী দই,শিশু ও কিশোরদের জন্য একটি পুষ্টিকর খাদ্য। দুধ গেঁজিয়ে তোলার এই পদ্ধতি উৎপন্ন খাদ্যকে দীর্ঘ সময়ের জন্য পচন মুক্ত রাখে, স্বাদ এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি করে। এই পদ্ধতিতে দুধকে গরম করা হয় এবং ঠান্ডা করা হয়।একটি বাটিতে এক বা দুই চামচ দই নিয়ে গরম দুধের সাথে যোগ করতে হবে। এটি গরম জায়গায় সারারাত বা পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা রেখে দিলে দুধ জমে দৈ হয়ে যাবে। চিড়া বা মুড়ির সাথে বা মৌসুমী ফলের সাথে দৈ মিশিয়ে খেতে খুবই সুস্বাদু লাগে।

সুষম খাদ্য ব্যবহার করতে সকলকে উৎসাহিত করুন

- প্রতি আহারে অনেকগুলি খাদ্যশ্রেনী।
- বিভিন্ন আহারে বিভিন্ন শাক-সব্জি ও ফল ব্যবহার করতে, কারন বিভিন্ন শাক-সব্জি ও ফল বিভিন্ন পরিমান ও প্রকারের পুষ্টি উপাদান সম্পন্ন।
- মাংস/পোলট্রি ও মাছ সপ্তাহে অন্তত দুইবার (যদি নিরামিষ ভোজী না হয়) এবং আস্ত ডাল, সীম, ছোলা বা মসুর যদি সম্ভব হয় প্রতিদিন, কারন এই খাদ্যগুলি আমিষ, লৌহ ও জিঙ্ক এর সবচেয়ে ভাল উৎস।
- আহারের সাথে অথবা দুই আহারের মাঝে ফল খাওয়া ভালো এবং প্রচুর পরিমানে পানি পান করতে হবে।
- আহারের পরে এক থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে চা বা কফি পান না করলেই ভালো যেহেতু এগুলি খাদ্যের মধ্যে থাকা লৌহের শোষণ কমিয়ে দেয়।
- যদি সম্ভব হয় দুই আহারের মাঝে কিছু খাদ্য যেমন দুধ, ঘোল, দৈ, চীনাবাদাম ভাজা, ছোলা ভাজা, খেজুর, আম, পেঁপে, কলা খাওয়া উচিৎ। এইভাবে নাস্তা খেলে সারাদিনের আহারে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকে না।

মডিউল - ৫
খাদ্যের পুষ্টিমান

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে জানা

ভূমিকা

আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার খাদ্য একাধিকবার খেয়ে থাকি। এসব খাবার থেকে কতখানি পুষ্টি পেয়ে থাকি এবং তা প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট কি না, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। তাই আমাদের খাবার সুষম করার জন্য বিভিন্ন খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদান বিশ্লেষণ করেই পুষ্টিমান নির্ণয় করা হয়। খাদ্যে ছয় ধরণের পুষ্টি উপাদান আছে। যথা-শর্করা, আমিষ, তেল/ চর্বি, খনিজ লবণ, খাদ্যপ্রাণ ও পানি। একই খাদ্যে বিভিন্ন রকমের পুষ্টি উপাদান থাকতে পারে এবং তা কোন কোন খাবারে কম বেশী থাকতে পারে।

প্রতিদিন আমরা যে সকল খাদ্য খেয়ে থাকি পুষ্টি উপাদানের উৎস ও পরিমান হিসাবে সেগুলোকে নিম্নের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

(ক) খাদ্যশস্য / শস্যজাতীয় খাদ্য : খাদ্য-শস্যকে শক্তিদায়ক খাদ্য বলে। চাল, গম, ভূট্টা, বার্লি ইত্যাদি শস্য জাতীয় খাদ্য। এগুলোতে শতকরা ৬৫-৭৫ ভাগ শর্করা, শতকরা ৭-১৪ ভাগ আমিষ থাকে। তাছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমানে ভিটামিন-বি$_১$, নায়াসিন, ক্যালসিয়াম ও লৌহ থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্য-শস্যে প্রায় ৩৫০ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এ শক্তির শতকরা ৯০ ভাগই আসে শর্করা থেকে।

(খ) মূল ও কন্দ জাতীয় খাদ্য : মূল ও কন্দে অধিক পরিমাণ শর্করা থাকে বলে এদেরকে শর্করা জাতীয় খাদ্য বলা হয়। গোল আলু, মিষ্টি আলু, কচু, মূলা ইত্যাদি মূল ও কন্দ জাতীয় খাদ্য । এ খাদ্যগুলিতে আমিষ, খনিজ লবণ ও ভিটামিন কম পরিমাণে থাকে।

(গ) ডাল জাতীয় খাদ্য : ডাল জাতীয় খাদ্যকে আমিষ জাতীয় খাদ্য বলে। বলা যায় ডাল হলো গরীবের মাংস, তবে এগুলি প্রাণীজ আমিষের চেয়ে নিম্নমানের। মুগ, মুসুর, ছোলা, শুকনা মটরশুটি, সীমের বীচি ইত্যাদি ডাল জাতীয় খাদ্য। এগুলিতে শতকরা প্রায় ২০ ভাগের বেশী আমিষ এবং উল্লেখযোগ্য পরিমান বি গ্রুপের ভিটামিন থাকে। ডাল জাতীয় আমিষের সাথে

খাদ্য-শস্য জাতীয় আমিষের মিশ্রণের ফলে উন্নত জাতের আমিষ তৈরী হয় যা প্রায় প্রাণীজ আমিষের সমান।

(ঘ) মাছ, মাংস, ডিম ঃ এ খাদ্যগুলি প্রাণীজ আমিষের উৎস । এগুলিকে শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়-পূরণকারী খাদ্য বলা হয়। মাছ, মাংস ও ডিমের আমিষ উন্নতমানের। মাছ ও মাংসে গড়ে শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ এবং ডিমে শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ আমিষ আছে। তাছাড়া এগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিমানে খনিজ লবণ ও খাদ্যপ্রাণ রয়েছে।

(ঙ) দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য ঃ দুধ একটি উৎকৃষ্ট, সম্পূর্ণ আমিষ জাতীয় খাদ্য। দুধ সহজেই হজম হয় এবং পুষ্টি উপাদান গুলিও সহজেই রক্তে শোষিত হয়। ইহা শিশুদের জন্য একটি আদর্শ খাদ্য। দুধে প্রায় সব পুষ্টি উপাদান কম বেশী থাকে এবং এর উপাদানগুলি উন্নতমানের । দুধে বেশী পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। দুধে সামান্য পরিমাণে ভিটামিন-সি থাকে। সেজন্য যেসব শিশু শুধু দুধের উপর নির্ভরশীল, তাদেরকে আলাদা ভাবে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাদ্য দেওয়া উচিত। দৈ, মাখন, পনির, ছানা ইত্যাদিও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য। এগুলি পুষ্টিমানের দিক থেকে ভাল।

(চ) তৈল/চর্বি জাতীয় খাদ্য ঃ তেল ও চর্বি ক্যালরির একটি ঘনীভূত উৎস। ১ গ্রাম তেল/ চর্বিতে ৯ কিলো ক্যালরি শক্তি থাকে। তেল /চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন শোষিত হতে এবং খাদ্যকে সুস্বাদু করতে তেল/চর্বির প্রয়োজন হয়। তেল/ চর্বিতে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকে না বললেই চলে। উদ্ভিজ তেল, ঘি, মাখন, চর্বি, ডালডা, ইত্যাদি এই শ্রেণীর খাদ্য।

(ছ) শাক-সবজি ঃ শাক-সবজিতে সাধারণত বিভিন্ন খনিজ লবণ এবং ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। এজন্য শাক-সবজিকে রোগ প্রতিরোধক খাদ্য বলা হয়। এতে ক্যালরির ও আমিষের পরিমাণ খুব কম। গাঢ় হলুদ ও সবুজ শাক-সবজিতে বেশী পরিমানে ক্যারোটিন থাকে যা খাওয়ার পর ক্ষুদ্রান্তে ভিটামিন 'এ' তে রূপান্তরিত হয়।

(জ) ফল-মূল ঃ ফল খাবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলি আমাদের খাবারে রং বৈচিত্র ও স্বাদ যোগ করে। ফল হল আমাদের প্রতিদিনের আহারে স্বল্প মাত্রায় প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজের প্রাকৃতিক ভান্ডার। ফলে প্রচুর পরিমানে খনিজ লবণ ও ভিটামিন থাকে। বাংলাদেশে সারা বছর বিভিন্ন ধরনের ফল ফলে। ভিটামিন-সি এর জন্য ফলের গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ ফল রান্না করে খেতে হয় না তাই ফলের সবটুকু ভিটামিন-সি দেহে কাজে লাগে। এজন্য আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন ফল অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। হলুদ রং এর ফলে (পাকা আম, পাকা পেঁপে) বেশী পরিমাণে ভিটামিন-এ অর্থাৎ ক্যারোটিন থাকে।

- প্রতিদিন আহারে বিভিন্ন প্রকার ফল ও সবজির ব্যবহার জনপ্রিয় করা প্রয়োজন।
- খাদ্য প্রস্তুতকরনে সঠিক উপায় জানা জরুরী যাতে রান্নায় পুষ্টি উপাদান কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অধিকাংশ পুষ্টি উপাদানই থেকে যায়।
- খাদ্য প্রস্তুতকরনের সময় পুষ্টিমান এবং সামগ্রিক খাবারের গুন-মান বৃদ্ধির জন্য সঠিক খাদ্য সমন্বয় করে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সবজি এবং ফল ভিটামিন ও খনিজ লবন সরবরাহ করা ছাড়াও ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট নামে আরেকটি সুরক্ষা বস্তুর ও আধার হিসাবে কাজ করে। এগুলি পুষ্টি উপাদান নয়, তবে এদের গুরুত্ব আছে। গবেষনায় দেখা গেছে নিয়মিত নানা প্রকার ফল ও সবজি খেলে হৃদরোগ, চোখের ছানি, চোখের নানা প্রকার ক্ষয়জনিত রোগ, ডায়াবেটিস এবং কয়েক প্রকার ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

বিভিন্ন উপায়ে খাদ্যের শ্রেনীবিভাগ করা হয়েছে। এ রকম একটি শ্রেনীবিভাগ নিম্নে দেয়া হল

মুখ্য বা মূল খাদ্য ঃ সাধারণতঃ সস্তা খাদ্য যাতে (ক) শ্বেতসার (শক্তির জন্য), (খ) আমিষ, অনু পুষ্টি (বিশেষ করে কিছু ভিটামিন বি-গ্রুপ আছে) ও খাদ্য আঁশ আছে এবং (গ) স্নেহ বা তেল ।

(১) শস্য-দানা হিসেবে চাল, গম, চিড়া, মুড়ি, সুজি, কাউন, সাগুদানা, ভূট্টা, যব, শ্বেতসার (স্টার্চ) জাতীয় খাদ্য। শ্বেতসার সমৃদ্ধ ফল-মূল হল, গোল আলু, মিষ্টিআলু, কচু, শিমুল আলু, শালগম।

(২) শুটি (যেমন- মটর শুটি, ফিল্ড বিন, সীম, বাদাম ইত্যাদি) আমিষ জাতীয় শষ্য। শুটি থেকে কিছু অনুপুষ্টি ও আঁশ পাওয়া যায়। ডালে উন্নত মানের আমিষ পাওয়া যায় এবং কিছু খনিজ (যেমন লৌহ, জিংক, এবং ক্যালসিয়াম) পাওয়া যায়।

(৩) বাদাম ও তেলবীজ চর্বির ভালো উৎস এবং অন্যান্য খনিজ বিশেষ করে আয়রন, জিঙ্ক এবং ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। তেলবীজ থেকে তৈরী তেলে শুধু চর্বি পাওয়া যায় কোন খনিজ পাওয়া যায় না।

(৪) খেসারী, মসুর, ছোলা, মুগ ও মাষকলাই এর ডাল কম চর্বি বা স্নেহ পদার্থ যুক্ত খাদ্যের উদাহরন। সয়াবিন উচ্চ চর্বি বা স্নেহ পদার্থ যুক্ত খাদ্যের উদাহরন। মিষ্টি কুমড়ার বীচি, তিল তেলবীজ এবং চীনাবাদাম, নারিকেল এর মধ্যে স্নেহ পদার্থ আছে।

(৫) দুধ, ডিম, মাছ, মাংস আমিষ প্রধান খাদ্য। মায়ের বুকের দুধ শিশুর জীবনের প্রথম ৬ মাস প্রয়োজনীয় সব পুষ্টির যোগান দেয়। পরবর্তীতে ২ বছর বয়স পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টির আংশিক যোগান দেয়। দুধ, দৈ, ছানা, পনির, ঘোল উন্নত মানের আমিষ, তেল এবং অনু পুষ্টি যেমন ক্যালসিয়াম এর ভাল উৎস। ডিম হল উন্নত মানের আমিষ, ফ্যাট ও অনেকগুলি অনু পুষ্টির উৎকৃষ্ট উৎস। মাংস ও প্রানী দেহের অন্যান্য অংশ এবং মাছ উন্নত মানের আমিষ ও চর্বির অন্যতম উৎস। এগুলি থেকে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমান লৌহ (বিশেষ করে লাল মাংস ও মাংসের বর্জিত অংশ), জিঙ্ক, এবং ভিটামিন বি গ্রুপ সহ আরও অনেক অণু পুষ্টি পাওয়া যায়। সমস্ত ধরনের কলিজা লৌহ ও ভিটামিন- এ' র ভালো উৎস। হৃৎপিন্ড, কিড্নী, আয়রন ও জিংকের ভালো উৎস। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ, যেমন, মলা, ঢেলা, ইত্যাদি ভিটামিন এ' এর ভালো উৎস। প্রানীজ আমিষের উদাহরণ হল-

গরুর দুধ, দই, পনির, ঘোল। গরুর মাংস, ছাগলের মাংস, ভেড়ার মাংস, মুরগির মাংস, যকৃত বা কলিজা, মাছ, দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ (মলা, ঢেলা, ইত্যাদি) শুঁটকি মাছ ও ডিম।

(৬) ফ্যাট, তৈল ও চিনি ফ্যাট ও তৈল হল শক্তির ঘন উৎস। এক চামচ চিনির তুলনায় এক চামচ রান্নার তেল দ্বিগুন শক্তি দেয়। ফ্যাটে অনেক প্রকার ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফ্যাটের ভাল উৎস গুলি হলঃ ঘি, তেল, বাদাম, তেলবীজ, পনির, চর্বিযুক্ত মাংস, মাছ ও সামুদ্রিক মাছ। চিনি শুধু শক্তি দেয় অন্য কোন পুষ্টি দেয় না। অসুস্থতার সময় এটা শুধু মিষ্টি স্বাদ আনে এবং ক্ষুধা বাড়ায়। সরবৎ, মিষ্টি, পেষ্ট্রি, স্ন্যাক্স এগুলি প্রচুর চিনি দিয়ে তৈরী। এগুলি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। প্রচুর চিনি দাঁতের জন্য ক্ষতিকর, চিনি দাঁতের ক্ষয় করে। অনেক সময় জটিল রোগের সৃষ্টি করে।

(৭) শাক-সব্জী ও ফল অনু পুষ্টি ও খাদ্য আঁশের উৎস হল শাক-সব্জী ও ফল। এ গুলির পরিমান নির্ভর করে কী প্রকারের সব্জী ও ফল গ্রহন করা হয় তার উপর। ভিটামিন - এ এর ভাল উৎস হল কমলা রংয়ের ফল যেমন, আম, পেঁপে, এবং কমলা রংয়ের সব্জী যেমন গাজর, মিষ্টি আলু । গাঢ় সবুজ শাকে আয়রন, ফোলেট এবং ভিটামিন - এ পাওয়া যায়। টক জাতীয় ফল যেমন লেবু, কামরাঙা, লটকন, কমলা লেবু ইত্যাদিতে ভিটামিন - সি পাওয়া যায়। কিছু সব্জিতে যেমন টমেটো, পিয়াঁজ এ ক্যান্সার এবং রসুনে হৃদরোগ প্রতিরোধের অনুপুষ্টি আছে। শরীরে প্রতিটি অনুপুষ্টি নিশ্চিত পেতে হলে প্রতিদিন প্রচুর পরিমানে শাক সব্জী ও ফল-মূল খেতে হবে। বাংলাদেশে সাধারনত যে সব শাক-সব্জি ও ফল-মূল পাওয়া যায় সেগুলো হল, সবজি যেমন- টমেটো, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, পটল, বেগুন, ঝিংগে, ধুন্দল, চিচিংগা, বরবটি, চালকু-মড়া, মিষ্টি কুমড়া, করলা, সীম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, ঢেঁড়স ইত্যাদি। শাক পাতা হল - পালং শাক, মেথি শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, ডাটা শাক, নটে শাক, সরষে শাক, সজনে শাক, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, ইত্যাদি। ফলের মধ্যে পাওয়া যায়- আম, পেঁপে, কমলা, সফেদা, আতা, জাম্বুরা, কলা, কামরাঙ্গা, আনারস, খেজুর, কাঁঠাল, লটকন, জামরুল, পেয়ারা, জাম, আমলকী, আমড়া, বেল, ইত্যাদি।

(৮) খনিজ পদার্থ, মশলা এবং সুগন্ধবর্ধক খনিজ পদার্থ যেমন-সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, পটাশিয়াম, লৌহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অনুপুষ্টি। খাবার লবণ, সামুদ্রিক মাছ সোডিয়ামের উৎস। কোন কোন খাবার রান্না করার সময় এবং অনেক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে লবন ব্যবহার করা হয়। রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ কমে গেলে স্নায়ুবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই পরিমিত পরিমান লবন খাওয়া দরকার। ডি-হাইড্রেশন হলে শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ কমে যেতে পারে ফলে শরীরে জটিলতা হতে পারে। তবে বেশী লবন খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এতে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি হতে পারে। ক্যালসিয়াম অস্থি, হাড়, দাঁত তৈরী ও রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। দুধ, দৈ, পনির, মাছ, তিল বীজ, বাদাম, সয়াবিন, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদির হাড়ে ক্যালসিয়াম আছে। আয়োডিনের অভাব হলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ অনুপুষ্টি, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে আয়োডিন সাহায্য করে। আয়োডিন যুক্ত খাবার লবন থেকে আয়োডিন পাওয়া যায়। এ ছাড়া মাছ, সামুদ্রিক মাছ, শাক সব্জিতে আয়োডিন আছে। পটাশিয়াম একটি অনুপুষ্টি যা খুব অল্প পরিমান শরীরের জন্য প্রয়োজন কিন্তু এর অভাব হলে স্নায়ুবিক জটিলতা ও অন্যান্য জটিলতা হতে পারে। ডাবের পানিতে প্রচুর পরিমানে পটাশিয়াম থাকে। লৌহ রক্তের কোষ কলায় অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যাওয়া ও লোহিত রক্ত কনিকার আমিষ হিমোগ্লোবিন তৈরীতে সাহায্য করে। শরীরে রক্ত স্বল্পতা রোধ করে। মাছ, মাংস, যকৃত, হৃৎপিন্ড, কিডনী, গুড়, খেজুর থেকে লৌহ পাওয়া যায়। জিঙ্ক দেহের বৃদ্ধি, স্বাভাবিক গঠন, ও রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। মাছ, মাংস, দুধ, দই, চীনা বাদাম, ডাল, সীম, শস্যদানা, গোল আলু, কুমড়া বীজ থেকে জিঙ্ক পাওয়া যায়। দেহকে সুগঠিত করা, লোহিত রক্তকনিকা তৈরী এবং ভ্রুণের অস্বাভাবিকতা রোধে সাহায্য করে, ফোলেট। সীম, ডাল, চীনা বাদাম, সতেজ সব্জী বা ঘন সবুজ পাতা , যকৃত, ডিম থেকে ফোলেট পাওয়া যায়। থায়ামিন বা ভিটামিন-বি২, শরীরে শর্করাজাতীয় খাদ্য বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করে; চর্বি ও আমিষ থেকে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে এবং দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করে। থায়ামিন বা ভিটামিন-বি$_১$ এর উৎস হল চর্বিবিহীন মাংস, কলিজা, ডিম, দুধ, মাছ, এবং ঢেঁকি ছাঁটা সিদ্ধ চাল, ডাল, গম, যব, ইস্ট, মটরশুঁটি। মাংস, কলিজা এবং গম, ডাল. বাদাম, তৈল বীজ, ছোলা ও শাক-সব্জিতে এ নায়াসিন আছে যা কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে সাহায্য করে এবং কার্বোহাইড্রেট ও আমিষ থেকে দেহের চর্ব্বি উৎপাদনে সাহায্য করে। এ ছাড়া ভিটামিন বি১২ কো-এনজাইম হিসেবে দেহে কাজ করে এবং রক্তের লোহিত কণিকার আকার স্বাভাবিক রাখে। প্রানীজ উৎস যেমন- কলিজা, মগজ, হৃৎপিন্ড, কিডনি, মাংস, মাছ, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য, ডিমের কুসুম ও গরুর কলিজা থেকে ভিটামিন বি$_{১২}$ পাওয়া যায়। পিয়াঁজ, রসুন ঔষধি এবং মশলা যেমন ধনে, জিরা, হলুদ, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, তেজপাতা খাদ্যকে সুস্বাদু ও সুগন্ধি যুক্ত করে। এ ধরনের খাবারে কিছু উপাদান আছে যা খাবার হজম ও শোষনে সহায়তা করে ও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। এগুলি থেকে কিছু অনুপুষ্টি ও পাওয়া যায়। তবে এ সকল মশ্‌লা অতিরিক্ত ব্যবহার করলে পাকস্থলীতে সমস্যা হতে পারে, পরবর্তীতে খাবার হজমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

(৯) পানিঃ প্রতিদিন আট থেকে দশ গ্লাস পানি পান করতে হবে। গরমের সময়, পেট খারাপ হলে ও জ্বর হলে আরো বেশী করে খেতে হবে। ফলের রস, ফল, চা, কফি, স্যুপ,সব্জি থেকেও পানি পাওয়া যায়। দেহের রাসায়নিক পরিবর্তনে সাহায্য করা, খাবার হজম, বিশোষণ বা আত্মভূতকরণ, খাবার সংগ্রহ ও মল নিঃসারণ করা, শরীরে তাপমাত্রা রক্ষা, অত্যধিক গরমে শ্বসন এর মাধ্যমে শরীরকে ঠান্ডা রাখা, শরীরে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পুষ্টি উপাদান পৌছানো, শরীরের জোড়া অংশ নড়াচড়ায় সাহায্য করা এবং শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বের করা পানির কাজ।

মডিউল -৬

পুষ্টি সম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও রন্ধন পদ্ধতি

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রেখে খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও কিভাবে রান্না করতে হয় সে সম্পর্কে জানা

ভূমিকা

সাধারণতঃ কোন খাদ্য খেতে হলে রান্না করতে হয়। দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য যথাযথ গ্রহণ করা এবং তা শরীরে ঠিক মতো কাজে লাগানোর জন্য রান্না করা অপরিহার্য।

খাদ্যদ্রব্য রান্না করার কতগুলি উদ্দেশ্য রয়েছে যেমন-

- রান্না করার ফলে শক্ত খাদ্যবস্তু নরম হয়ে হজমের উপযোগী হয়
- মাছ, মাংস, ডাল, শাক-সব্জি ইত্যাদি কাঁচা খাওয়া যায় না, রান্না করলে এগুলি খাওয়ার উপযোগী এবং সহজপাচ্য হয়
- তেল মশ্লা দিয়ে রান্নার ফলে খাদ্যবস্তু স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে আকর্ষণীয়, রুচিসম্মত এবং আহারোপযোগী হয়
- রান্নার ফলে খাদ্যে অন্তর্নিহিত ক্ষতিকর জীবানু সমূহের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায়।

রান্নার ফলে শর্করা, আমিষ এবং তৈল জাতীয় উপাদান খুব কমই নষ্ট হয়। কিন্তু কিছু কিছু খনিজ লবণ, যেমন- সোডিয়াম, ক্লোরিন এবং পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন- ভিটামিন 'বি' এবং 'সি' খুব বেশী নষ্ট হয়। শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে চাল, গম, যব, ভূট্টা, আলু ইত্যাদি কাঁচা খেলে হজম করা কষ্টকর হয়। কিন্তু রান্নার ফলে এসব খাদ্যের বাইরের শক্ত আবরণটি ফেটে শ্বেতসার আবরণ মুক্ত হয়ে পড়ে এবং তাপের ফলে কিছু অংশ ডেক্সট্রিনে পরিণত হয় যা সহজপাচ্য ।

সাধারণতঃ ভাত রান্নার পূর্বে চাল ৪-৫ বার অনেক পানি দিয়ে ধোয়ার ফলে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন সমূহ নষ্ট হয়ে যায়। তারপর ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় চাল ফুটিয়ে ভাত রান্না করা হয়। এতে শর্করা, ধাতব লবণ, ভিটামিন 'বি' পানিতে দ্রবীভূত হয়ে মাড় তৈরী হয়, যা ফেলে দিলে ভাত ঝরঝরে হয়। ভাতের মাড় ফেলে দিলে তার সাথে দ্রবীভূত 'বি' ভিটামিন ছাড়াও শতকরা ১০ ভাগ শর্করা এবং শতকরা ৬০ ভাগ পর্যন্ত ফসফরাস নষ্ট হয়ে যায়। ভাতের পুষ্টি অপচয় রোধ করার জন্য রান্নার পূর্বেই চাল ঝেড়ে বেছে নিতে হয়। তারপর অল্প পানিতে ধুয়ে চাল সিদ্ধ হওয়ার জন্যে যতটুকু পানির প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পানি ব্যবহার করে বসা ভাত রান্না করলে মাড় ফেলার প্রয়োজন হয় না; এতে অনেক পুষ্টি উপাদানের অপচয় রোধ করা যায়।

গম থেকে যে আটা বা ময়দা তৈরী হয় তাতে গমের সব পুষ্টি উপাদানই বর্তমান থাকে। গমের মধ্যে গ্লাইডিন এবং গ্লুটেন দুই ধরনের আমিষ রয়েছে যা পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে আঠাল পদার্থে পরিণত হয়। পাউরুটি তৈরীর জন্য সাধারণত ঈস্ট মিশানো হয়, ফলে পাউরুটির পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় ক্ষার জাতীয় বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয় যার সংস্পর্শে ভিটামিন 'বি' নষ্ট হয়ে খাদ্যের পুষ্টিমান কমে যায়।

আলু রান্নার সময় কাটার পূর্বে ধুয়ে নিতে হয়। কাটার পর আলুর টুকরো পানির মধ্যে রাখা ঠিক নয়, কারণ ভিটামিন 'বি১', 'বি২' এবং ভিটামিন 'সি' পানিতে দ্রবীভূত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। আলু কাটার সময় খোসা ফেলে না দিয়ে খোসাসহ কেটে রান্না করলে বেশ কিছু পুষ্টি উপাদান রক্ষা করা যায়।

রান্নার ফলে স্নেহ বা চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য, যেমন- ঘি, ডালডা ইত্যাদি তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না, পুষ্টিমান প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। তবে অত্যধিক তাপে স্নেহ পদার্থ ভেঙে প্রথমে ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারল উৎপন্ন হয়। পরে এই গ্লিসারল হতে অ্যাক্রোলিন নামক বিষাক্ত পদার্থ তৈরী হয় যা থেকে পেটের অসুখ হতে পারে। এ জন্যে একই তৈল দিয়ে বার বার পিঠা, জিলাপী ইত্যাদি ভাজা ঠিক নয় বরং ভাজার জন্য যতটুকু তৈলের দরকার ঠিক ততটুকু তৈলই ব্যবহার করা শ্রেয়। সুতরাং, স্নেহ জাতীয় পদার্থে অত্যধিক তাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

মাছ, মাংস, ডাল, ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্য ভালো করে সিদ্ধ করা প্রয়োজন, নতুবা হজমে অসুবিধা হতে পারে। মাংস রান্না করাই শ্রেয়। এতে মাংসের তন্তু সমূহ নরম হয়। মাংস রান্নার সময় অল্প পানি ব্যবহার করতে হবে এবং মাংসের পানি ফেলে দেয়া উচিত নয়। কারণ ফেলে দিলে ধাতব লবণের অপচয় হয়। মাংস অল্প জ্বালে সিদ্ধ করতে হবে এবং ঢেকে রান্না করতে হবে। অত্যধিক উত্তাপে মাংসের 'বি' ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। মাছ ভাজার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মাছ তেলের মধ্যে ডুবে থাকে, অন্যথায় মাছের পুষ্টি উপাদানের অপচয় ঘটবে।

ডাল রান্নার সময় উত্তমরূপে সিদ্ধ করা উচিত। পানির সাথে ফুটালে ডালের পুষ্টিমূল্য নষ্ট হয় না বরং উত্তাপের ফলে আমিষ সহজপাচ্য হয় এবং অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা যায়। দুধ ভালো করে ফুটিয়ে খাওয়া আবশ্যক। দুধ সহজেই নানান রকম জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে, তাই কাঁচা দুধ বা একবার ফুঠানো ঠান্ডা দুধ খেতে হলে পুনরায় ফুটিয়ে নিতে হবে। দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় বলক আসার পর প্রায় ১০ মিনিট ফুটাতে হবে। খনিজ লবণ ও ভিটামিনের সবচেয়ে সহজলভ্য এবং ভালো উৎস হল শাক-সব্জি ও ফল-মূল।

শাক-সব্জি রান্না করতে গিয়েই আমরা সবচেয়ে বেশী উপাদান নষ্ট করে থাকি। কিছু কিছু শাক-সব্জি যেমন- ধনেপাতা, পুঁদিনা পাতা, লেটুস পাতা, গাজর, মুলা, শশা ইত্যাদি কাঁচা খাওয়া যায়। আবার কতগুলো মোটামুটি সিদ্ধ করলেই খাওয়া যায়।

শাক-সব্জি, ফলমূল অনেকক্ষণ খোলা বাতাসে রাখলে পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়। তাই শাক-সব্জি তাজা ও টাটকা অবস্থায় খাওয়া উচিত। শাক-সব্জি কাটা, ধোওয়া এবং রান্নার সময় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি নিয়ম এখানে বর্ণনা করা হল ঃ

- রান্নার ঠিক পূর্বে তাজা শাক-সব্জি প্রথমে বেছে নিয়ে পরিস্কার পানিতে ভালো করে ধুয়ে কাটতে হবে। কাটা শাক-সব্জির পুনরায় ধোয়া বা পানিতে রাখা যাবে না;
- পরিস্কার ও ধারালো দা বা বটি দিয়ে যতটা সম্ভব বড় বড় এবং সমান সাইজ করে কাটতে হবে। টুক্রা ছোট বড় এবং এবড়ো থেবড়ো হলে পুষ্টি উপাদান বেশী নষ্ট হয়;
- সব্জি কাটার সময় যতটা সম্ভব খোসাসহ কাটতে হবে, কারণ খোসার নিচেই বেশীর ভাগ ভিটামিন থাকে। প্রয়োজনে খোসা পাত্লা করে ফেলতে হবে। যদি রান্না করতে দেরী হয় তা হলে সব্জি গুলিকে ঠান্ডা স্থানে ঢেকে রাখা উচিত;
- ছোট মুখের গর্তযুক্ত পাত্রে শাক-সব্জি রান্না করা উচিত। ছড়ানো মুখ সম্পন্ন পাত্রে রান্না করলে বাতাসের অক্সিজেন সব্জির সংস্পর্শে বেশী আসে, ফলে ভিটামিন বেশী নষ্ট হয়;
- শাক সিদ্ধ করার জন্য কোন পানির প্রয়োজন নেই। শাকের পানিই যথেষ্ট;
- সব্জি সিদ্ধ করা পানি কোনমতেই ফেলা উচিত নয়। সবজির সাথেই শুকিয়ে নেয়া যেতে পারে;
- রান্নার সময় পাত্রের মুখ ঢাক্না দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে যেন বাইরের বাতাস পাত্রের ভিতর প্রবেশ করতে না পারে;
- শাক-সবজির স্বাভাবিক রঙ বজায় রাখতে হয়। মাংস, ডাল ইত্যাদি তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করার জন্য ক্ষার জাতীয় পদার্থ যেমন- সোডা ব্যবহার করা উচিত নয় । কেননা, এতে ভিটামিন 'সি' এবং 'বি' নষ্ট হয়ে যায় এবং
- লোহা বা তামার পাত্রে রান্না না করে মাটির বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না করা উচিত। কারণ, লোহা ও তামার সংস্পর্শে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়ে যায়।

মডিউল -৭
অপুষ্টিজনিত রোগ ঃ রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- শরীর অপুষ্ট হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় । অপুষ্টির সংজ্ঞা এবং অপুষ্টির প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা।
- সমাজে অপুষ্টির নানা কারণ ও তার ফলাফল ব্যাখ্যা করা।
- অপুষ্টিজনিত রোগ- রোগের লক্ষণ, কারণ এবং প্রতিকার সম্বন্ধে জানা ।

ভূমিকা

অপুষ্টি কি?

অপুষ্টি হল মানুষের শরীরের খাদ্য চাহিদার এমন একটা অসামঞ্জস্য অবস্থা । যা ঘটে মূলতঃ একটি খাবার যার মধ্যে পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণে থাকে না অথবা খুব বেশী পরিমাণে থাকে, যার ফলে স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়। অপুষ্টি হতে পারে ক্যালরি বা শক্তি, আমিষ, শর্করা, ভিটামিন বা খনিজ দ্রব্যের ঘাটতির কারণে। প্রয়োজন মত উপাদান না থাকলে বলা হয় পুষ্টি-স্বল্পতা এবং বেশী থাকলে বলা হয় স্থূলতা।

অপুষ্টির প্রকারভেদ

(১) মাত্রাতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা ঃ যখন দেহের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার তুলনায় খাদ্য গ্রহন বেশী হয় তখন অনেক সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে দেহে মাত্রাতিরিক্ত ওজন হতে পারে, অনেক সময় দেহ অস্বাভবিক মোটা হতে পারে যাকে স্থূলতা বলে। পরিশ্রমবিহীন জীবনযাপন ও অধিক শক্তিদায়ক খাদ্য গ্রহণ করাই হল মাত্রাতিরিক্ত ওজনের কারণ।

(২) স্বল্প পুষ্টি বা অপুষ্টি ঃ যখন দেহের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার তুলনায় খাদ্য গ্রহণ কম হয় তখন পুষ্টি ঘাটতি ঘটে। মানসিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলেও পুষ্টির ঘাটতি হতে পারে, ফলশ্রুতিতে দেহ যথেষ্ট খাদ্যবস্তু ব্যবহারে সক্ষম হয় না। যখন একজন মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণ করে তখন তার অপুষ্টি হতে পারে, পরিনামে অপুষ্টির অভাবজনিত রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যদি খাদ্য গ্রহণ কম হয় এবং খাদ্য থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় শক্তি এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের স্বল্পতা হয় তখন দেহাভ্যন্তরের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য দেহ পেশী ও চর্বিতে সঞ্চিত শক্তিকে ব্যবহার করতে শুরু করে, ফলে ওজন কমে যায়। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অপুষ্টি ও মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী থাকে। শিশুদের বৃদ্ধি থেমে যায় এবং ওজন কমে যায়। যদি পরিমান মত খাদ্য খাওয়া না হয়, তবে একটি শিশু অপুষ্ট হতে থাকে (কোয়াশিওরকর বা ম্যারাসমাস)। যদি কোন গর্ভবতী মা কম পুষ্টি পায়, তার গর্ভে থাকা শিশুর যথাযথ বিকাশ ঘটে না।

সমাজে অপুষ্টির নানা কারন ও তার ফলাফল

অপুষ্টি কখনো কখনো পুষ্টি স্বল্পতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। গর্ভকালীন সময়ে পুষ্টি স্বল্পতা হলে বা শিশুর বয়স দুই বছর বয়সের আগে হলে তখন এটি শারীরিক ও মানসিক সমস্যাসহ একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যা হতে পারে। খুব বেশী পুষ্টিহীনতাকে না খেয়ে থাকাও বুঝায়। অপুষ্টির ফলে খর্বতা, অল্প উচ্চতা, পাতলা শরীর, খুব কম শক্তি, পা বা শরীরের নীচ অংশ ফোলা হতে পারে। মানুষের শরীরে দ্রুত সংক্রমণ হতে পারে বা কখনো কখনো ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে। গৌন উপাদানের অভাবে নানা অসুখ দেখা দিতে পারে।

পৃথিবীতে দুইশত কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। এর মধ্যে প্রতি বছর ২৬ লাখ শিশু মারা যায়। যা পৃথিবীর সমস্ত শিশুর ১/৩ ভাগ। পৃথিবীর প্রতি ৪ জনের ১ জন খর্ব আকৃতির হয়। আমাদের দেশে এই হার প্রতি ৩ জনে ১ জন। এর মানে হল তাদের শরীর অপুষ্টির জন্য পরিপূর্ণ বিকশিত হয় না। অপুষ্টি বংশ পরম্পরায় হতে পারে। যে মা অপুষ্ট শিশু জন্ম দেয়, যদি সে মেয়ে শিশু হয় তাহলে তারা যখন মা হয় তখনও অপুষ্ট শিশু জন্ম দেয়। এই খারাপ চক্র চলতে থাকে। বাংলাদেশে অপুষ্টি বা স্বল্প পুষ্টির হার বিশ্বে সবচেয়ে বেশী। অনেক কারণে অপুষ্টি বা পুষ্টিস্বল্পতা হতে পারে। অপুষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ হল দারিদ্রতা, পারিবারিক খাদ্য উৎপাদনের অভাব, এবং খাদ্য মজুত, রক্ষনাবেক্ষণ (ফুড সিকিউরিটি) ব্যবস্থার দূর্বলতা ও নিম্ন মানের খাদ্য নির্বাচন। এই সমস্যাগুলি প্রত্যেককে খাবারের উপর বেঁচে থাকার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, যা সুস্থ জীবন যাপনের জন্য সব খাদ্য উপাদান সরবরাহের ব্যবস্থা করেনা এবং অপুষ্টিতে ভোগায়। বাংলাদেশের খাবারে অন্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে কম অশর্করা খাদ্য থাকে। এ থেকে বোঝা যায় এদেশের খাদ্যে খুব অল্প পুষ্টি উপাদান ও অন্যান্য পুষ্টি বৈচিত্রতা (ফুড ডাইভারসিটি) থাকে। পরিনামে গৌণ উপাদানগুলির স্বল্পতা ঘটায়। এছাড়া যত্নের ঘাটতি যেমন (১) শিশুকে সঠিক পদ্ধতিতে না খাওয়ানো এবং সঠিক যত্নের অনভ্যাস, (২) মহিলাদের যত্নের অভাব (বিশেষত গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময়,ও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়), (৩) বাড়ীতে খাদ্য প্রস্তুতের ভুল পদ্ধতিও অপরিচ্ছন্নতা এবং (৪) বাড়ীতে চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুরাবস্থা অপুষ্টির কারণ ঘটায়।

আরও বলা যায়, স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যেমন- (১) বসবাসের অনুপযুক্ত পরিস্থিতি (২) স্বাস্থ্য পরিসেবার খারাপ মান (সঠিক ঔষধের ঘাটতি এবং প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব) রোগের ঝুঁকি বাড়ায় এবং(৩) স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অভাবেও জনগণ অপুষ্টি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকে।

বাংলাদেশে মহিলাদের নিম্ন সামাজিক অবস্থাও অপুষ্টির অন্যতম কারন। এর মধ্যে পড়ে (ক) দারিদ্রতা এবং কর্ম-সংস্থানের অভাব (খারাপ জীবন ধারনের অবস্থা, অস্থায়ী কর্ম ও স্থানান্তর) (খ) সমাজ, জেলা ও রাষ্ট্রীয় স্তরে সম্পদের অসম বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ, (গ) মহিলাদের নিম্ন মানের জীবন ধারন ও শিক্ষা, (ঘ) পরিবেশের অবনতি বা জলবায়ু পরিবর্তন, (ঙ) রাজনৈতিক অস্থিরতা (চ) অসমতা বা অসাম্য।

অপুষ্টির ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ?

ছোট শিশু, গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মা, এইচ. আই. ভি এবং এইড্‌স নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের অপুষ্টির ঝুঁকি বেশী। অপুষ্টি শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে কম ওজনযুক্ত শিশুর জন্মহার বেশী হওয়ার অন্যতম কারণ হল গর্ভাবস্থায় পুষ্টির অভাব। অপুষ্টি শিশুকে দূর্বল করে ও শিখন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

বিভিন্ন প্রকারের অপুষ্টির বিষয়ে নীচে আলোচনা করা হল

কম ওজন ঃ বয়সের তুলনায় ওজন কম হওয়ার দ্বারা কম ওজন নির্ণীত হয়। বাংলাদেশে শিশুদের বৃদ্ধির উপর নজরদারীতে এই সূচক বেশী ব্যবহৃত হয়। পাঁচ বছরের নীচে কম ওজন সম্পন্ন শিশুদের সংখ্যা ৩৩ শতাংশ।

দীর্ঘ স্থায়ী অপুষ্টি ঃ দীর্ঘ স্থায়ী অপুষ্টি হল দীর্ঘদিনের অপুষ্টিজনিত অবস্থা। নির্দিষ্ট বয়স অনুযায়ী কম উচ্চতা দ্বারা এটি নির্ণীত হয়। এটি নানা কারনে হতে পারে, যেমন জীবনের প্রথম দুই বছরে কম খাওয়ানোর অভ্যাস। এর ফলে বৃদ্ধি কমে যায় যা অপরিবর্তনীয়। পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের ৩৬% শিশু দীর্ঘ স্থায়ী অপুষ্টিতে ভোগে।

স্বল্পস্থায়ী অপুষ্টি ঃ স্বল্পস্থায়ী অপুষ্টি হল অল্প সময়ে অপুষ্টিজনিত অবস্থা যা প্রায়শই সংক্রমনের জন্য জটিল আকার ধারন করে। উচ্চতার তুলনায় কম ওজন দ্বারা এটি প্রকাশিত হয়। এটা মাপা হয় উর্দ্ধ বাহুর মধ্য পরিধির এবং ইডিমা (চামড়ার নীচে এবং শরীরের কিছু অংশে অতিরিক্ত পানি জমে থাকা বিশেষতঃ দুই পায়ের পাতায়) নামক সূচক দিয়ে। বাংলাদেশে ১৪ শতাংশ শিশু স্বল্পস্থায়ী অপুষ্টিতে আক্রান্ত।

অনুপুষ্টি ঘাটতিজনিত অপুষ্টি ঃ যদি খাবারে নির্দিষ্ট অনুপুষ্টি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম থাকে তাহলে মানুষ অনুপুষ্টি ঘাটতিজনিত অপুষ্টিতে ভুগতে পারে।

নীচে অপুষ্টিজনিত কয়েকটি রোগ- রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার বর্ননা করা হল-

হাড্ডিসার বা ম্যারাস্‌মাস

লক্ষণ

- শরীরের মাংসপেশী শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে যায়;
- শরীরের ওজন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়;
- মুখ-মন্ডল বানরের মতো হয়ে যায়;
- শিশুর শরীর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়;
- পেট বড় হয়ে যায়;
- শিশুর মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে যায়;
- শিশুর ডায়রিয়া বা পাত্‌লা পায়খানা হতে পারে ;
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তস্বল্পতাও দেখা দিতে পারে এবং
- শিশুর ক্ষুধা বেশী হয়, একটু পর পর খেতে চায়।

কারণ

- তাপ ও শক্তিদায়ক এবং শরীর গঠন ও বৃদ্ধিকারী খাদ্য সঠিক পরিমানে না খাওয়ানো;
- শিশু ঘন ঘন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে;
- বাড়তি খাবার না খাওয়ালে এবং
- নানা রকম কু-সংস্কারের ফলে শিশুকে সঠিক খাদ্য ঠিকমত না খাওয়ালে

প্রতিকার

- প্রচুর পরিমাণে অধিক পুষ্টিমানের শক্তিদায়ক এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য উপযোগী করে বারে বারে খাওয়াতে হবে;
- ডায়রিয়া বা কৃমি বা অন্যান্য সংক্রামক রোগ থাকলে ডাক্তারের পরামর্শমত খাবার স্যালাইন বা অন্যান্য ওষুধও খাওয়াতে হবে এবং
- মারাত্মক অবস্থায় হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে।

গা ফোলা বা কোয়াশিয়র্‌কর

লক্ষণ

- শিশুর সমস্ত শরীর বিশেষত হাত, পা এবং মুখমন্ডলে পানি বা রস জমা হয়ে ফুলে যায়;
- মুখ-মন্ডল দেখতে গোলাকার এবং ফ্যাকাশে দেখায়;
- মাথার চুল খুব পাত্‌লা ও বাদামী হয়ে যায় এবং চুল উঠে যায়;
- স্থানে স্থানে লাল্‌চে চর্মরোগের সৃষ্টি হয়;
- যকৃত বা কলিজা কিছুটা বড় হয়ে যায়;
- শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং
- শিশুর প্রায়ই ডায়রিয়া বা পাত্‌লা পায়খানা হয়।

কারণ

- আমিষ জাতীয় খাদ্যের মারাত্মক ঘাট্‌তি হলে। একই সাথে শক্তিদায়ক খাদ্যেরও অভাব থাকে।

প্রতিকার

- উৎকৃষ্ট আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন-দুধ, মাখন, ঘি, দুধের সর ইত্যাদি অধিক পরিমাণে উপযোগী করে খাওয়াতে হবে;
- শিশুর ডায়রিয়া থাকলে খাওয়ার স্যালাইন এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে ঔষধ খাওয়াতে হবে এবং
- মারাত্মক অবস্থায় ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে অথবা হাসপাতালে ভর্তি করে জরুরী চিকিৎসা করাতে হবে।

ম্যারাস্‌মিক কোয়াশিয়র্‌কর

লক্ষণ

- মুখ-মন্ডল শুকিয়ে বানরের মতো হয়ে যায় এবং হাত পায়ে পানি বা রস জমা হয়ে ফুলে যায়;
- দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়;

- রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় এবং
- প্রায়ই ডায়রিয়া বা পাত্‌লা পায়খানা হয় এবং মলে খুব দুর্গন্ধ হয়।

কারণ

- শিশুদের খাবারে দীর্ঘদিন শক্তিদায়ক ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব হলে এবং
- ঘন ঘন ডায়রিয়া বা পাত্‌লা পায়খানা হলে, শিশু পরিমিত পরিমাণে মায়ের দুধ না পেলে।

প্রতিকার

- প্রচুর পরিমাণে শক্তিদায়ক ও আমিষ জাতীয় খাদ্য উপযোগী করে খাওয়াতে হবে;
- জন্ম থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত অবশ্যই শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে;
- শিশুর ৬ মাস বয়স থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি শক্তি ও আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে উপযোগী করে খাওয়াতে হবে এবং
- প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ মত চিকিৎসা করাতে হবে।

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব

লক্ষণ

- চোখের সাদা অংশের রং পরিবর্তন হয়ে বাদামী হয়ে যায়;
- চোখের পানি কমে গিয়ে সাদা অংশ শুষ্ক হয়ে যায়;
- চোখ লাল হয়ে যায়;
- অল্প আলোতে চোখে ঝাপ্‌সা বা কম দেখে;
- উজ্জ্বল আলোর দিকে সরাসরি তাকাতে পারে না;
- চোখে ফুলি পড়ে (বিটট্ স্পট) এবং
- চোখের মণিতে ঘা হয়ে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায়।

কারণ

- ভিটামিন 'এ'র অভাব হলে;
- শিশুকে মায়ের দুধ না খাওয়ালে;
- বাড়তি খাবারে ভিটামিন -এ সমৃদ্ধ খাদ্য কম কিংবা না থাকলে
- শিশুর স্বাভাবিক খাবারে ভিটামিন-এ জাতীয় খাদ্য কম থাকলে এবং ডায়রিয়া কিংবা হাম্ হলে।

প্রতিকার

- প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন-কলিজা, মাছের তেল, ডিম, মাখন এবং গাঢ় রঙিন শাক-সব্‌জি ও ফল-মূল খাওয়াতে হবে;
- শাক-সব্‌জি রান্নায় অবশ্যই পরিমিত পরিমাণ তেল ব্যবহার করতে হবে এবং
- প্রয়োজনে ভিটামিন-এ ক্যাপ্‌সুল খাওয়াতে হবে।

মুখের বা ঠোঁটের কোণায় ঘা

লক্ষণ

- ঠোঁট লাল হয়ে ফেটে যায়;
- মুখের বা ঠোঁটের দুই কোণায় ঘা হয়;
- কষ্ (লালা) পড়ে ও মুখ হা করতে কষ্ট হয় এবং
- জিহ্বায় ঘা হয়, লাল হয়ে ফুলে যায় ও ব্যথা হয় এবং খেতে অসুবিধা হয়।

কারণ

- খাবারে ভিটামিন-বি২ বা রাইবোফ্লাভিনের ঘাট্‌তি হলে এবং
- দুধ, ডিম, ডাল, কলিজা, সিদ্ধ চাল এবং শাক-সব্‌জি প্রয়োজনীয় পরিমাণে না খেলে।

প্রতিকার

- প্রচুর দুধ, ডিম, ডাল এবং শাক-সব্‌জি খেতে হবে;
- মুখে বেশী ঘা হলে খাদ্যের সাথে ভিটামিন-বি২ বা রাইবোফ্লাভিন ট্যাব্‌লেট ১টি করে দিনে ৩ বার খেতে হবে।

রক্তস্বল্পতা

লক্ষণ

- মুখ-মন্ডল ফ্যাকাশে বা সাদা হয়ে যায়
- কাজ করলেই খুব ক্লান্ত হয়ে যায় এবং হাঁপাতে থাকে
- বুক ধড়ফড় করে
- বসা থেকে উঠলে মাথা ঘুরায় এবং বমি ভাব হয়
- জিহ্বা মসৃণ এবং সাদা হয়ে যায় এবং
- হাতের নখ উপরের দিকে উল্টিয়ে যায় এবং শরীরে পানি জমা হতে পারে

কারণ

- খাবারে প্রধানত লৌহের (আয়রন) ঘাটতি হলে
- খাবারে আমিষের ঘাটতি হলে
- খাবারে ভিটামিন-সি এর ঘাটতি হলে
- কৃমিতে আক্রান্ত হলে
- দুর্ঘটনায় অত্যধিক রক্তক্ষরণ হলে এবং
- বাচ্চা প্রসবের পর ঠিকমত লৌহসমৃদ্ধ খাবার না খেলে

প্রতিকার

- প্রচুর পরিমাণে লৌহসমৃদ্ধ ও আমিষ জাতীয় খাদ্য এবং সাথে সাথে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাদ্য খেতে হবে
- কৃমি থাকলে চিকিৎসা করাতে হবে
- মারাত্মক অবস্থায় লৌহ ও আমিষ সমৃদ্ধ খাবারের পাশাপাশি ডাক্তারের পরামর্শ মতো আয়রন ট্যাবলেট খেতে হবে

ঘ্যাগ্ বা গলগন্ড

লক্ষণ

- প্রাথমিক পর্যায়ে ঢোক্ গেলার সময় কিছুটা (সুপারির মতো) ফুলে উঠে
- দ্বিতীয় পর্যায়ে দূর থেকেই গলাফুলা আছে বুঝা যায়
- তৃতীয় পর্যায়ে গলাফুলা আরো বড় হয়ে যায়

কারণ

- আয়োডিনের অভাবই ঘ্যাগের মূল কারণ।

প্রতিকার

- প্রচুর পরিমাণে আয়োডিনসমৃদ্ধ খাবার যেমন- সামুদ্রিক মাছ/শুট্‌কি খেতে হবে, আয়োডিন মিশ্রিত লবণ খেতে হবে এবং লিপিওডল ইন্‌জেক্‌শন নিতে হবে।

স্কার্ভি

লক্ষণ

- দাঁতের মাড়ি লাল হয়ে ফুলে যায়;
- সামান্য আঘাতে দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত ঝরে;
- দাঁতের গোড়া মাড়ি থেকে আল্‌গা হয়ে যায় ফলে দাঁত নড়ে, মাড়িতে ঘা ও পুঁজ হয় এবং
- চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ দেখা দেয়।

কারণ

- দীর্ঘদিন যাবৎ খাবারে ভিটামিন-সি এর ঘাটতি থাকলে।

প্রতিকার

- প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার প্রতিদিন খেতে হবে
- প্রয়োজনে ভিটামিন-সি ট্যাব্‌লেট খেতে হবে।

রিকেট্‌স

লক্ষণ

- সময় মতো বসতে, উঠতে, দাঁড়াতে, হামাগুড়ি দিতে পারে না
- সময় মতো হাঁটতে পারে না, শিশুর দাঁত উঠতে দেরী হয়।

- শিশুর হাত ও পায়ের হাড় বাঁকা হয়ে যায়।

কারণ

- ভিটামিন-ডি এর অভাব হলে এবং ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ক্যাল্‌সিয়াম শরীরে শোষিত হতে না পারলে।

প্রতিকার

- প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ খাদ্য এবং সাথে সাথে ক্যাল্‌সিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্যও খেতে হবে;
- তাছাড়া শিশুর শরীরে ভিটামিন-ডি তৈরী করার জন্যে দৈনিক কিছু সময়ের জন্য তাকে খালি গায়ে রৌদ্রে রাখতে হবে।

মডিউল -৮
বসত-বাড়ীতে শাক-সব্‌জির চাষ

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

ভালো পুষ্টি এবং একই সাথে পরিবারে আয় বৃদ্ধির জন্য বসত-বাড়ী সংলগ্ন জায়গাতে শাক-সব্‌জি চাষ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সর্ম্পকে সচেতনতা তৈরী।

ভূমিকা

পৃথিবীতে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি জমি কমে যাওয়া, মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, মানুষের শহরমুখী হওয়া, শ্রমিক অপ্রতুলতা, জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি নানা কারণে খাদ্য উৎপাদন কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ছে। যথাযথ পরিমানে নিরাপদ খাদ্য সব সময়ে পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে আজও উল্লেখযোগ্য মানুষের পক্ষে সঠিক সময়ে সব ধরনের বা সঠিক খাদ্য পাওয়া কঠিন। তবে পরিবারগুলো যদি সময়মত বীজ, কৃষির আনুষাঙ্গিক অন্যান্য উপকরণ ও সঠিক তথ্য পায় তবে তারা নিজেদের শ্রম ব্যবহার করে নিজ জমিতে শাক-সব্‌জি উৎপাদন করে পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা অনেকাংশে মিটাতে পারে। পৃথিবীতে মানুষের খাদ্য চাহিদা মিটানোর অতি পুরাতন কৌশল হল মনুষ্য বসতির কাছাকাছি খালি জায়গায় কৃষিকাজ ও পশুপালন করে খাদ্য উৎপাদন করা। বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে মানুষের বসত-বাড়ীর আশেপাশে বেশ কিছু জায়গা থাকে। পরিবারগুলি সাধারণত এ সমস্ত জায়গায় (সাধারণতঃ ৫০০ থেকে ১৫০০ বর্গমিটার) বেশ কিছু সবজি চাষ করে। বসত-ভিটার চারিপাশের এই জায়গাগুলি পারিবারিক খাদ্য সরবরাহে বিশেষ অবদান রাখছে। পরিবারে পুষ্টি সরবরাহে বসত-ভিটার চারিপাশের এই জায়গাকে সব্‌জি উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বসত-ভিটা সংলগ্ন জায়গায় নানা ধরনের ফল, সব্জি, খাদ্য-শস্য, ভেষজ উদ্ভিদ, মশলা উৎপাদন,করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময় বসত-ভিটা সংলগ্ন জায়গা পতিত পড়ে থাকে। এই জায়গা শিশুদের খেলা, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল-ভেড়া পালন, ফলের গাছ লাগানো, সবজি চাষ, উৎপাদিত শস্য ও কৃষি উপকরন মজুত, এবং যন্ত্রপাতি রাখার কাজে ব্যবহার করা যায়। খাদ্য উৎপাদন করে বিক্রির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির মত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বসত-ভিটার গুরুত্ব রয়েছে যার মাধ্যমে পরিবারের সামগ্রিক উন্নতি ঘটে বসত-বাড়ীতে পরিকল্পিতভাবে গড়া শাক-সব্জি চাষ পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখে। সাধারণতঃ কম স্বচ্ছল পরিবারগুলোর কাছে এই সব্জি বাগান কয়েকটি নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদানের একমাত্র উৎস। বিশেষ করে ফসল কাটার আগের মুহূর্তে বা যখন ফলন হয় না তখন এই সব্‌জি বাগানগুলিই খাদ্য ও পুষ্টি উপাদানের একমাত্র উৎস হিসাবে থাকে। উৎপাদিত খাদ্য বাড়ন্ত বয়সের শিশুদের শক্তি ও প্রোটিনের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। দরিদ্র শ্রেনীর মানুষ যখনই বাসস্থান পরিবর্তন করছে ও শহরমুখী হচ্ছে তখন এই দেশীয় প্রাকৃতিক খাবারগুলি পাচ্ছে না, ফলে অপুষ্টিজনিত হুমকিতে পড়ছে। আগে যেসব প্রচলিত দেশীয় খাদ্য গ্রামীন মানুষের সুষম খাদ্য নিশ্চিত করত কৃষি বানিজ্যিকরণের ফলে সেগুলি হারাতে বসেছে। বাগানে উৎপাদিত ও কীট্‌নাশকমুক্ত এমন ফল ও সব্জি যেগুলি সারা বছর পাওয়া যায় সেগুলি দরিদ্র পরিবারগুলির পুষ্টির উৎস হতে পারে যা অন্য কোন উপায় তারা পায় না। বসত-ভিটার সব্জি বাগান থেকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ফসল পাওয়া যায় যা সতেজ এবং খাবারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের যোগান বাড়াবে। বছরের সব ঋতুতেই পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সঠিক খাদ্য প্রয়োজন। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি থেকে বর্ষার মাঝামাঝি পর্যন্ত সাধারনতঃ খাদ্য উৎপাদন কমে যায়। বর্ষার শুরুতে শিশুরা নানা রকমের অসুখে আক্রান্ত হয়।

তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খনিজ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন। একটি পরিপুর্ণ বাগানই পারে বছরের সব ঋতুতে প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিতে। পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা শাক-সব্জি চাষ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দিতে পারে।

বসত-বাড়ীর আঙ্গিনা বা এর আশে-পাশের জমিতে জন্মানো শাক-সব্জি পরিবারে গ্রহণের পর যেটুকু বেঁচে যায় তা বাজারে বিক্রি করে পরিবারের আয় বাড়ানো যায়। আগে যা কিনতে হত তা উৎপাদন করার ফলে খরচ বেঁচে যায়। অন্য কথায় বলা যায় এটি এক প্রকার আয় বৃদ্ধি। সব্জি-বাগানের নগদ আয়ই অনেক সময় সমাজের অনশন, ঋণবৃদ্ধি, কঠিন পরিশ্রম ও তুলনামুলকভাবে ভালো থাকার তফাৎ গড়ে তোলে। সব্জি-বাগান স্থাপনের আয় গৃহস্থের খাদ্যের সরবরাহের কাজে লাগে। কিছু খাদ্য-শস্য, পশু, মাছ বা সব্জি বাগান স্থাপনের ফলে পরোক্ষ উৎপাদন (যেমন হস্তশিল্প, আচার বা সংরক্ষিত উৎপাদন, ইত্যাদি) বাজারে বিক্রয় বা বিনিময় করে খাদ্য বা পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজন (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা বস্ত্র ইত্যাদি) মিটানো যায়। পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা শাক-সব্জি চাষ নারীদের কর্ম-সংস্থান তৈরী করে। ভূমিহীন নারীদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ কম হয় সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে। সব্জি-বাগান স্থাপনের মাধ্যমে নারীরা পরিবারের জন্য রোজগার করতে পারে। যেহেতু নারীরা পরিবারিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার মূল দ্বায়িত্বে থাকে , তাই তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পরিবারের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখে। বসত-ভিটা সংলগ্ন এক খন্ড জমিতে সারা বছর শাক-সব্জি ফলিয়ে সুন্দর বাগান তৈরী করে পরিবারে খাদ্যের সংস্থান বাড়ানো যেতে পারে। এই বাগানের বৈশিষ্ট্য হল পরিবার ও সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা। গ্রামে মূলতঃ বাড়ীর বাইরে কাজ করা ভূমিহীন কৃষক, বর্গাচাষী, দিনমজুর ও দরিদ্র পরিবার বাস করে। তাদের বা অন্যান্য গৃহস্থ পরিবারের বসত-ভিটার সামান্য পরিমাণ জমিতে শাক-সব্জির এ বাগান করা যেতে পারে। এ বাগান বাড়ীর নারীরা পরিচর্যা করতে পারে। যদি নারীরা বসত-ভিটায় বাগানের কাজে যুক্ত হন, তবে পরিবারের পুষ্টির বিষয়ে তাদের অংশ গ্রহণ বাড়বে। ফলে বাগান থেকে উৎপাদিত ফসলের দ্বারা উপকৃত হয়ে পরিবারের সদস্যদের জীবিকা বৃদ্ধি পাবে। কৃষি উৎপাদনের কাঁচামালের (যেমন:বীজ, সার, চারা, কীট্নাশক) উচ্চমূল্য এসব ভূমিহীন প্রান্তিক পরিবার গুলির পক্ষে বহন করা কঠিন। স্বল্প মুল্যের উপকরণ যেমন মিশ্র সার, বেড়া,রোগ ও পোকা দমনে জৈবিক উপায় ব্যবহার করে ভালো সব্জি উৎপাদন করা সম্ভব। অনেক প্রকার সব্জি বীজ স্থানীয় ভাবে বাগানেই উৎপন্ন করা যায়। দেশীয় শাক-সব্জি যেমন লাল নটে শাক, সবুজ নটে, পালং, লাল শাক, পুঁই শাক, ধনে পাতা, সজনে পাতা ইত্যাদি এবং অন্যান্য সবজি যেমন চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, ঝিংগা, চিচিংগা, করলা, লাউ, বরবটি, ইত্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব। সুতরাং বসত-ভিটায় সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা একটি বাগান হল একটি সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থা যা দিতে পারে পুষ্টিকর খাদ্য, সারা বছর ধরে প্রধান খাদ্য ছাড়া পরিবারের প্রয়োজনীয় অন্যান্য খাদ্য, বাগানের তাজা সব্জি, বাগানে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়,ও গুরুত্বপূর্ণ কৃষি খামার কর্মগুলির প্রসার। একটি সুন্দর সব্জি বাগান পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ করে। বসত-ভিটায় সব্জি বাগান করা এক ধরণের পরিবেশবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা। বিভিন্ন প্রকার সব্জি চাষের ফলে মাটিতে গাছের পুষ্টি উপাদান নিঃশেষ রোধ করে। বাগানে বৃক্ষ, কন্দ, লতা, গুল্ম সমন্বয় করে চাষ করলে মাটির উর্বরতা শক্তি সংরক্ষন ও বৃদ্ধি হয়। সব্জি বাগান যেখানে স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী একাধিক প্রজাতির চাষ হয়, সেখানে পোকা ও রোগ দমনে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার না করে চাষ-বাস চর্চার উপর নির্ভর করা উচিৎ। গৃহ সংলগ্ন সব্জি বাগান স্থাপনা । ঐতিহ্যগত ভাবেই বিবিধ উদ্ভিদের জিন সম্পদ সংরক্ষণে এক উৎকৃষ্ট আধার। ধারাবাহিকভাবে লাগানো সব্জি বাগান প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ (ভিটামিন- এ ও লৌহ) যোগান নিশ্চিত করে। বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিন -এ এর স্বল্পতা এক বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের দীর্ঘ মেয়াদী উপায় হচ্ছে সমস্যা সংকুল শ্রেণীর কাছে ভিটামিন -এ সমৃদ্ধ খাবার সময়মত ও ঠিক মত পৌঁছাচ্ছে কিনা তার উপর। রক্তস্বল্পতা আরেকটি বেশী মাত্রার সমস্যা। এদেশের শিশু, গর্ভবতী নয় এমন মহিলা এবং গর্ভবতী মহিলার অর্ধেক রক্তস্বল্পতায় ভোগে। বসত-ভিটায় সব্জি উৎপাদনের মাধ্যমে উৎপন্ন ফল ও সব্জি হল এ সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে কার্যকরী ফল। গ্রামের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলে সুসংগঠিত সব্জি বাগান দেখা যায়। এই সমস্ত পরিবারগুলোর সারা বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্য শস্য, শাক-সব্জি, ফলমূল, গবাদি-পশু পালন এবং মাছ চাষ করার জন্য ভালো ধারণা, কৌশল এবং সম্পদ আছে। একটি পরিকল্পিত ভাবে তৈরী করা সব্জি বাগানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ এর উপস্থিতি দেখা যায়। বড় গাছ ও ছোট গাছ সামঞ্জস্য রেখে লাগানো হয়। গাছগুলি এক সাথে বেড়ে উঠে, পরিপক্ক হয় বিভিন্ন সময়ে। তাই দেখা যায় দৈনিক খাদ্যের প্রধান অংশ পাওয়া যায় বাড়ীর বাগান থেকে। শস্য, প্রাণি-সম্পদ, মাছ, ইত্যাদি একত্রে রূপ নেয় সুষম খাদ্যে। যা প্রয়োজনীয় শক্তি, আমিষ, খনিজ ও ভিটামিন এর প্রয়োজন মিটায়। তাই বলা যায় কম খরচে ও পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে পারিবারিক খাদ্য উৎপাদনের ক্ষুদ্র উদ্যোগই উন্নয়নশীল বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে গুরুত্বপুর্ণ স্বাস্থ্য ও আর্থিক লাভ নিশ্চিত করতে পারে। বসত-বাড়িতে কৃষিকাজ এর সুযোগ তৈরীর মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যায় একই সাথে পুষ্টির উন্নয়ন এর প্রতি নজর দেয়া যায়।

মডিউল -৯
বাড়ীর আঙ্গিনায় ফল চাষ

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- খাবারে ফলের গুরুত্ব আলোচনা করা
- বাড়ীর আঙ্গিনায় ফলের গাছ রোপণের মাধ্যমে পরিবারে পুষ্টি নিশ্চিত করা ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করা
- ফলের গাছ লাগানোর মাধ্যমে জন-সাধারনের পুষ্টির উন্নয়ন কি ভাবে করা যায় তা জানা।

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমানে ফল চাষ হয়ে থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই ফল পছন্দ করে। সারা বছরই কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়। আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, লিচু, আতা, সফেদা, কামরাংগা, করমচা, কমলা, বৈঁচী, পেঁপে, কলা, আনারস, বড়ই, আমড়া ইত্যাদি নানা ফল মানুষের রসনা নিবৃত করে। এসব ফলে ক্যালরি, ফ্যাট, সোডিয়াম কম থাকায় পুষ্টিগুণ বিবেচনায় মানব দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পুষ্টিগুণে এসব ফলের আছে নানা রকম গুরুত্ব।

খাবারে ফলের গুরুত্ব

- ফলে শতকরা প্রায় ৯০-৯৫ ভাগ পানি থাকে । মানবদেহে পুষ্টি উপাদান চলাচল, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, শরীরের জয়েন্ট গুলিকে আর্দ্র রাখা, বর্জ্য পদার্থ বের করার জন্য এই পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- ফল খাদ্য আঁশের ভালো উৎস। আঁশ পরিপাকতন্ত্রে খাদ্য চলাচল সহজ করে। তাই নিয়মিত ফল খেলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়। এমনকি উচ্চ রক্তচাপসহ হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। সাধারণতঃ দৈনিক ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার।
- ফলে শর্করা জাতীয় পদার্থ আছে যা দেহের শক্তি যোগায়। ফলের শর্করা সাধারণতঃ চিনি জাতীয় (গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ) যা দ্রুত ভেঙ্গে শক্তি দেয়।
- মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক খারাপ কোলেস্টেরল ফলে নেই বললেই চলে।
- ফলে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন, মিনারেল, অনুপুষ্টি, পিগমেন্ট, এন্টি-অক্সিডেন্ট (পলিফেনলিক ফ্লাভোনয়েপস, অ্যান্থোসায়ানিন, লাইকোপিন) আছে যেগুলি একদিকে যেমন মন ও শরীর সতেজ রাখে অন্য দিকে ক্যান্সার, অ্যালঝেইমার, ত্বকের রোগ, বুড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে। এছাড়াও নতুন টিস্যু তৈরী, মেধা গঠনে, চুল পড়া রোধ করতে ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় এসব ফল একদিকে যেমন মানবের জন্য জীবনদায়ী উপাদানে পূর্ণ অন্যদিকে এদের আছে রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা। তাই প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় ফল রাখা উত্তম।

বসত-বাড়ীর আঙ্গিনায় ফলের গাছ রোপণের মাধ্যমে পরিবারে পুষ্টি নিশ্চিত করা ও অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করা

এ দেশের আবহাওয়া ও মাটি ফল চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশে প্রায় ১৩০ প্রজাতির ফল ফলে থাকে। এর মধ্যে ৯ টি প্রধান। আমাদের পুষ্টি চাহিদা মিটানোর জন্য দৈনিক জনপ্রতি ৪০০ গ্রাম শাক-সব্জি ও ফল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা গড়ে মাত্র ২১১ গ্রাম শাক-সব্জি ও ফল খেয়ে থাকি। প্রাচীন কাল থেকেই বসত-বাড়ীতে ফল গাছের আবাদ হয়ে আসছে। এক সময় বসত-বাড়ীতে উৎপাদিত ফলেই প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানো যেত। জন সংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ বাজারের বিদেশী ফলের দিকে ঝুঁকছে। এতে মানুষ আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও বসত-বাড়ীতে ফল আবাদ করে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি আর্থিক ভাবে লাভবান হতে পারি।

বসত-বাড়ীর আঙ্গিনায় ফল গাছের গুরুত্ব

- ফলগাছ খাদ্যের যোগান দেয় ও পুষ্টির অভাব মিটায়
- বিভিন্ন রোগের ঔষধ ও পথ্য হিসেবে ফলের অবদান রয়েছে
- আচার, জ্যাম, জেলী ইত্যাদি তৈরী করে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়
- জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন পাওয়া যায়
- ফল গাছ মাটির ক্ষয় রোধ ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করে
- পশু-পাখির খাদ্যের উৎস
- পাখির বাসস্থান
- আসবাবপত্র, যান-বাহন ও কুটির শিল্পের উপকরণ পাওয়া যায়
- জ্বালানীর জন্য কাঠ পাওয়া যায়

বসত-বাড়ীর আঙ্গিনায় ফল গাছ লাগানোর জন্য জায়গা নির্বাচন

- বাড়ীর আঙ্গিনা বা আশে পাশের অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে
- বৃষ্টির পানি যাতে জমে না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- রৌদ্রোজ্জল, পরিস্কার ও বাতাস চলাচলের উপযোগী জায়গা হতে হবে। তবে লেবু জাতীয় ফল ছায়ায় হয়।
- পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। মাটি বেলে দো-আঁশ কিংবা দো-আঁশ হলে ভালো হবে।

বসত-বাড়ীর আঙ্গিনায় ফল চাষের সম্ভাবনা

- আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়া ফল গাছ লাগানোর উপযোগী হওয়ায় দেশের প্রায় সব জায়গায় ফল গাছ লাগানো যায়। বাড়ীর আঙ্গিনার সাথে যদি বাড়তি এক টুক্‌রা জমি থাকে তবে সেখানে ফল চাষ করতে পারে।
- বসত-বাড়ী সংলগ্ন পুকুরপাড়ে, পতিত জমিতে বা রাস্তার ধারে ফলের গাছ লাগিয়ে ফলের উৎপাদন করা যায়। এতে পরিবারের চাহিদা মিটিয়েও আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়।
- কলমের মাধ্যমে চারা তৈরী করে দেশীয় ফলের উৎপাদন বাড়ানো যায়
- কলমের চারা দিয়ে অল্প জায়গায় বেশী ফল গাছ লাগানো সম্ভব
- উন্নত পরিচর্যার মাধ্যমে অধিক ফল উৎপাদন করা যায়
- বারমাসী জাতের বিভিন্ন ফলের গাছ লাগিয়ে ফলের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। বসত-বাড়ীতে বার মাস বিভিন্ন ধরনের ফল পাওয়ার জন্য নিচের ছক মোতাবেক ফল গাছ লাগানো যেতে পারে

ছক ৮. বারমাসী বিভিন্ন ধরনের ফলের জাত ও লাগানোর সময়

মাসের নাম	ফলের নাম	জাতের নাম
বৈশাখ	আম	গোপালভোগ, গোপালখাস
জ্যৈষ্ঠ	আম	ল্যাংড়া, হিমসাগর, খিরসাপাতি
	কাঁঠাল	বারি কাঁঠাল ১, স্থানীয় উন্নত জাত
	জাম	স্থানীয় উন্নত জাত
	জামরুল	থাই জামরুল
	লিচু	চায়না ২, বোম্বাই, বেদানা
আষাঢ়	আম	নীলাম্বরী, সূর্যপুরি, ফজলী, আম্রপালি
	পেয়ারা	ইপসা পেয়ারা ১, বারি পেয়ারা ১, থাই পেয়ারা
	বাতাবি লেবু	থাই বাতাবি লেবু, স্থানীয় উন্নত জাত
শ্রাবণ	আম	বারি আম ৪, আশ্বিনা
ভাদ্র	তাল	স্থানীয় জাত
আশ্বিন	কদবেল	বনলতা, স্থানীয় উন্নত জাত
কার্তিক	নারিকেল	বারি নারিকেল
অগ্রহায়ণ	কলা	অমৃতসাগর, সবরি
	লেবু	কাগজী লেবু
পৌষ	পেঁপে	রেড লেডী, শাহী পেঁপে, স্থানীয় উন্নত জাত
মাঘ	স্থানীয় কুল (বরই)	স্থানীয় উন্নত জাত
	কলা	স্থানীয় উন্নত জাত, সাগর, সবরি, চাঁপা
ফাল্গুন	কুল বরই	আপেল কণ্ডল, বাউকুল, নারিকেলী কুল

সূত্রঃ বসত-বাড়ীতে শাকসব্জি ও ফল উৎপাদন প্রশিক্ষন ম্যানুয়েল এবং আইএফএমসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

মডিউল -১০

পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নে বনজ ও ভেষজ গাছের ভূমিকা

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নে বনজ ও ভেষজ গাছের ভূমিকা
- বনজ ও ভেষজ গাছ সম্বন্ধে জানা।
- বনজ সম্পদ এর সুরক্ষা ও পরিচর্যার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা
- নবায়নযোগ্য সম্পদের অফুরন্ত উৎস হিসেবে বন।

ভূমিকা

বন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। একটি দেশের তেল বা খনিজ সম্পদ কোন না কোন সময়ে শেষ হতে পারে। কিন্তু বনজ সম্পদ কখনও ফুরায় না যদি এর সুরক্ষা ও পরিচর্যার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা থাকে। তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, বন সম্পদ সৃজনে ও সংরক্ষণে তুলনামূলকভাবে ব্যয় হয় অনেক কম। তাই বনকে বলা হয় নবায়নযোগ্য সম্পদের অফুরন্ত উৎস ।

পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নে বনের অবদান

১। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য ঃ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বনাঞ্চলের ফল, মূল, লতা, পাতা খেয়ে পুষ্টি গ্রহণ করে। বনাঞ্চলের মধু সবচেয়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ। সুন্দরবনের মোহনায় বহু রকমের মাছ, কাঁকড়া. চিংড়ি, শামুক ও ঝিনুক পাওয়া যায় যা মানুষের খাদ্য। বন থেকে আমরা যে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল পাই তা হল জলপাই, আমলকী, বহেড়া. বেল, ঢেউয়া, উড়িআম, লট্‌কন, বেত, চাল্‌তা, কাউ, বনজমির, আমড়া, কাঠবাদাম, কালোজাম, পুতিজাম, গোলাপজাম, চাপালিশ, বরতা, হরপাতা, লতাকাঞ্চনা, করম্‌চা, দাড়িম্ব, কমলা, কলা, কামরাঙ্গা, লিচু, কাঁঠাল, আনারস, ইত্যাদি।

২। মাছের খাবার ঃ সুন্দরবন বা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বেশীরভাগ সময় পানির সংস্পর্শেই থাকে। এখানে নদী ও খাল হতে পানি আসে এবং জোয়ার ভাটায় সমুদ্রের পানি এসে আটকা পড়ে। গাছ-পালা হতে পাতা, ফুল, ফল, কান্ড পানিতে ঝরে পড়ে এবং পচে জৈব সারে পরিণত হয়। মাছ, শামুক, সকল প্রকার জলজ মৎস্যকুল এ সকল খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে।

৩। জ্বালানী কাঠ ঃ এদেশে এখনো অধিকাংশ মানুষ জ্বালানীর জন্য কাঠ ব্যবহার করে । এ কাঠের ৮০% আসে বনাঞ্চল হতে। জ্বালানী হিসেবে কেবল গাছের কাঠ নয়, পাতা ও বাকল ব্যবহার হয়, যা পরিবেশ বান্ধব।

৪। আসবাবপত্র ও গৃহ নির্মাণের জন্য কাঠ, বাঁশ, বেত ও লতা ঃ আসবাবপত্রের জন্য কাঠ, বাঁশ ও বেত প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে। এজন্য প্রধানতঃ মেহগনি, টিক্, শাল, গজারি, গামারি, কাঁঠাল, সুন্দরী, সেগুন, শিশু, বহেড়া, হরিতকী, আম, গর্জন ইত্যাদি গাছের কাঠ ব্যবহার হয়।

৫। বনজ উদ্ভিদের বীজ হতে তেল ঃ বনের বহু উদ্ভিদের বীজ হতে তেল পাওয়া যায়। এই তেল সাধারণত জ্বালানী, খাবার, মাথার চুলে এবং রং ও বার্নিশ তৈরীর জন্য ব্যবহার হয়। ঢাকা-ময়মনসিংহের বন হতে রায়না ও কুসুম গাছ হতে তেল হয়। যা হতে সাবান ও চুলের তেল উৎপাদন হয়। বাজনা ও মহুয়ার বীজ হতে খাবার ও জ্বালানী তেল পাওয়া যায়। পানিয়াম গাছের বীজ হতে সাবান ও জ্বালানী পাওয়া যায়। নিমের তেল দিয়ে চর্ম রোগ নিরাময় এবং শিমুল বীজের তেল হতে জ্বালানী ও সাবান তৈরী হয়। পাম গাছ হতে পাম তেল পাওয়া যায়।

৬। লাক্ষা, খয়ের, খেজুর গুড়, রেশম, আগর, তামাক ইত্যাদিও বন হতে পাওয়া যায়।

পরিবেশ রক্ষায় বনের অবদান

১। বায়ু মন্ডলের আর্দ্রতা ও তাপের সমতা বৃদ্ধি ঃ বনের গাছপালা সূর্য্যের আলো মাটিতে পড়তে দেয় না ফলে বনের মাটি গরম হয় না । বনের ভিতরে ঠান্ডা বেশী। এছাড়া গাছ প্রস্বেদনের মাধ্যমে বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প ছড়িয়ে দেয়। ফলে বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়ে তাপমাত্রা কমে আসে। গ্রীষ্মের ভর দুপুরে একটি বড় গাছ কমপক্ষে ১০০ গ্যালন পানি বাতাসকে উপহার দেয় যা ১০টি এয়ারকুলারের পক্ষে সম্ভব নয়।

২। বন্যা ও প্লাবন রোধ ঃ নদী, পুকুর, রাস্তা, বাঁধ, ঘর-বাড়ীর আশেপাশে যদি ঘন গাছের বন সৃষ্টি করা যায় তবে বন্যা ও প্লাবন হতে ঐ এলাকা রক্ষা পায়।

৩। ভূমির ক্ষয়রোধ ঃ গাছ-পালার শিকড় মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে। গাছপালা বা ঘাসহীন মাটি বৃষ্টির ফলে ধুয়ে যায়, ফলে মাটি ক্ষয় হয়। মাটির ক্ষয় সম্পর্কে এক গবেষণায় দেখা গেছে পৃথিবী থেকে প্রতি বছর ৪ বিলিয়ন টন অজৈব পদার্থ ও ৪০০ মিলিয়ন টন জৈব পদার্থ মাটির গা ধুয়ে সাগরে পড়ে।

৪। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি ঃ বনের পাতা, ডালপালা, বাকল, শিকড় ও বনের পশুপাখী ও কীট্-পতঙ্গের মল-মূত্র ও দেহাবশেষ মাটিতে মিশে, পঁচে জৈব সার হয় একে হিউমাস বলে। এ থেকে গাছ খাদ্য ও পুষ্টি পায়। মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৫। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস রোধ ঃ ঘন বনাঞ্চল বা সারিবদ্ধ গাছের বেষ্টনী বাতাসের প্রবল বেগ প্রশমিত করে। গ্রামাঞ্চলে বাড়ীর চতুর্দিকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা গাছের সারি বাতাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুন্দরবন এবং সমুদ্র উপকূলে বন বেষ্টনী সামুদ্রিক ঝড়কে দমিয়ে রাখে।

৬। বায়ু বিশুদ্ধ করন ঃ গাছপালা CO_2, CO গাছপালা ও ধূলাবালি অপসারণ করে এবং O_2 নির্গত করে। উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গাছ CO_2 গ্রহণ করে ও O_2 সরবরাহ করে বায়ু বিশুদ্ধ করে।

৭। পশু-পাখির আশ্রয়স্থল ঃ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য নানা জাতের পশু-পাখি, কীট-পতংঙ্গ প্রয়োজন, যাদের আশ্রয়স্থল বনাঞ্চল এবং গাছপালা। বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেলে এদের ধ্বংস অনিবার্য। ঘন বন তৈরী করে পশু-পাখি, কীট্-পতঙ্গের আশ্রয়স্থল রাখতে হবে।

৮। জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ঃ লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী, অনুজীব ও এদের পরিবেশ জীব-বৈচিত্র গড়ে তোলে পৃথিবীর সকল অঞ্চলে জীবের অবস্থান সমান নয়। পৃথিবীর শতভাগের ১৪ ভাগ হচ্ছে অরণ্য আর এখানেই জীবকূলের অর্ধেক বাস করে । বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেলে জীব-বৈচিত্রের বিলুপ্তি হয়ে পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার কারণে পৃথিবীও এক সময় বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে।

৯। মরু বিস্তার রোধ ঃ গাছপালার আচ্ছাদন না থাকলে মাটি শুকিয়ে যায়। বৃষ্টিতে এই মাটি ভেঙ্গে যায়, শুকালে বাতাসে উড়ে যায়। একসময় মাটি ধীরে ধীরে উর্বরতা হারিয়ে যায় ফলে ঘাসও জন্মাতে পারেনা। বাংলাদেশের উত্তরে বরেন্দ্র অঞ্চলে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে একসময় ঘন বন ছিল। ভারতের থর মরুভূমি প্রতিবছর ১ কি.মি. করে বাড়ছে।

ভেষজ উদ্ভিদ চাষের গুরুত্ব

১। সাধারণত বনে জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকা ঔষধি উদ্ভিদ থেকেই ভেষজ ঔষধের কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে চাষ না করার ফলে একদিন তা শেষ হয়ে যাবে।
২। ভেষজ উদ্ভিদ যথেষ্ট মাত্রার পরিবেশ বান্ধব। প্রায় সব উদ্ভিদের পরিবেশ বিশুদ্ধকরণের ক্ষমতা রয়েছে।
৩। অধিকাংশ ভেষজ উদ্ভিদ চাষে কৃত্রিম সার ও কীটনাশকের প্রয়োজন হয় না । তাই ভেষজ চাষাবাদে বিনিয়োগ কম ও তুলনামূলক ভাবে লাভ বেশী।
৪। মাশরুমসহ বেশ কিছু ভেষজ চাষে জায়গা কম লাগে।
৫। আর্থিক বিশ্লেষণে ভেষজ চাষ কৃষির চেয়ে লাভজনক।
৬। দেশে বিদেশে এর ব্যাপক চাহিদা থাকায় এর বাজারজাত খরচ কম।
৭। ভেষজ উদ্ভিদের চাষ অপেক্ষাকৃত কম শ্রমসাধ্য।
৮। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ৫০০ এর অধিক ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরীর প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৯। সমগ্র দেশে প্রতি বৎসর ১০০০ টনের ভেষজ কাঁচামালের চাহিদা রয়েছে।

১০। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ৪০০ কোটি টাকার ভেষজ দ্রব্য আমদানী করা হয়। আমদানী করা ভেষজ উদ্ভিদ হচ্ছে অনন্তমূল,অশোক, অর্জুন, অশ্বগন্ধা, আমলকী, কুরচি, গুলঞ্চ, বহেড়া, লতা চাকুলী, শ্যামলতা ইত্যাদি।

১১। সারা বিশ্বে ভেষজের ৬২ মিলিয়ন ডলারের বাজার রয়েছে। প্রতি বৎসর এই চাহিদা ১০ শতাংশ হারে বাড়ছে। এই বিশাল বাজারের অধিকাংশই ভারত ও চীনের দখলে।

ভেষজ উদ্ভিদের বহুমুখী ব্যবহার

১। এমন কিছু উদ্ভিদ আছে যা থেকে ঔষধ ছাড়াও ভেষজ কীটনাশক তৈরী করা যায়। যেমন, মেহগণি ও নিম গাছের ফল হতে যে কীটনাশক তৈরী হয় তা পরিবেশবান্ধব।

২। পানিফল বা সিংগাড়া ফল যা পরিত্যাক্ত অবহেলিত গ্রাম বাংরায় জন্ম নেয় তা অসামান্য পুষ্টিসমৃদ্ধ। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে পানিফলকে বলবর্ধক ও যৌবনদায়ী হিসাবে গণ্য করা হয়।

৩। সুন্দরবনের কেওড়া ফল যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ।

৪। বিকল্প শিশু খাদ্য হিসেবে আমাদের দেশে শটিমূলের ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ। শটিমূল শোধন বাদে তা পাউডার করে তারপর প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করা সম্ভব। এজন্য আমাদের উপযুক্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাব। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও চীন ভেষজ উদ্ভিদ, ভেষজ ঔষধি ও ভেষজ পণ্য উৎপাদনে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বহুদূর এগিয়েছে। আমাদেরও সুযোগ আছে এবং এজন্য চাই গবেষণা, সরকারী সাহায্য ও সহযোগীতা।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ঔষধি / ভেষজ গাছ

প্রাকৃতিক বৈচিত্রে গাছপালা এবং বৃক্ষরাজির অবদান অনস্বীকার্য। স্বাস্থ্যই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। স্বাস্থ্যকে সুস্থ, সবল নিরোগ রাখতে খাদ্য ছাড়াও গাছের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের চার পাশে যে সকল গাছপালা রয়েছে এসবই আমাদের প্রয়োজন মিটায়। পৃথিবীতে যত গাছপালা এবং বৃক্ষরাজি রয়েছে সেগুলোকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-ফলজ, বনজ এবং ভেষজ বা ঔষধি। বিভিন্ন রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধে বিভিন্ন ঔষধি গাছের ব্যবহার নিম্নে উল্ল্যেখ করা হলোঃ

ছক ৯. বিভিন্ন রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধে বিভিন্ন ঔষধি/ভেষজ গাছের ব্যবহার

ঔষধি গাছের নাম	ব্যবহৃত অংশ	যে রোগ প্রতিকার/ প্রতিরোধে ব্যবহার হয়
বাসক	পাতা, ছাল ও মূল	কাশি, শ্বাস কষ্ট ও রক্তচাপ
আকন্দ	পাতা, ছাল ও মূল	ক্যান্সার, সিফিলিস, কুষ্ঠরোগ ও চর্মরোগ
মেহেদি	পাতা ও ছাল	খুসকি, সদ্যটাক পড়া. কুষ্ঠরোগ ও চর্মরোগ
নিশিন্দা	সকল অংশ	ক্যান্সার, বাত ও জ্বর
মেথি	বীচি ও পাতা	ডায়াবেটিস, যৌনরোগ ও বাত
গাঁদা	ফুল, পাতা ও মূল	রক্ত পরিস্কার, কিড্নী সমস্যা, ঋতুশ্রাবজনিত সমস্যা
সর্পগন্ধা	মূলের রস	আমাশয় ও ডায়রিয়া
কামরাঙা	ফল ও পাতা	জ্বর, জন্ডিস, পাইলস, হাড় ভাঙ্গা
নম	ছাল, পাতা, ফুল ও ফল	বিষফোঁড়া, চুলকানি, খোস-পাঁচড়া
হিজল	মূল, পাতা ও বীচি	মূলের নির্যাস ডায়াবেটিস কমায়, পাতা-ডায়রিয়া ও বুকের ব্যথা, পেট ফাঁপা ও গ্যাস্ট্রিক রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা যায়

দশমূল	ছাল ও মূল	ছালের নির্যাস - ডায়রিয়া ও আলসার নিরাময় করে, মূলের নির্যাস বলকারক ও যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে
ঈলাশ	পাতা, ছাল	পাতার নির্যাস ফোঁড়া ও টিউমার নিরাময়ে ব্যবহার করা যায়, ছালের নির্যাস জ্বর, রক্তক্ষরণ বন্ধ করে
আমলকী	ফল ও ফুল	মলমূত্র বর্ধক, ঠান্ডাকারক, তাজা ও শুক্‌নো ফল ডায়াবেটিস, আমাশয়, রক্তস্বল্পতা, পেট ফাঁপা, অনিদ্রা ও বমি বন্ধ করে এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে
বহেড়া	ছাল, ফল ও শাঁস	শ্বেতীরোগে ব্যবহার হয় এবং অকালে টাক পড়লে চুল গজাতে বহেড়া বীজের শাঁস উপকারী। আমাশয়ে বহেড়া চূর্ণ সেব্য। আঘাতজনিত কারণে ফুলে গেলে ছাল বেটে একটু গরম করে প্রলেপ দিলে ফুলা কমে যায়।
হরিতকী	ফল ও ছাল	বদহজম, আমাশয়, জন্ডিস, পাইলস নিরাময় করে এবং ঋতুশ্রাবে ব্যথা কমায়
অর্জুন	ছাল	ছালের নির্যাস রক্ত চাপ কমায়। হৃদরোগে অত্যন্ত উপকারী। মচকে গেলে বা হাঁড়ে চিড় ধরলে এবং মেছতায় ছাল অত্যন্ত কার্যকরী
ডালিম	কুঁড়ি, ছাল, খোসা এবং ডালিমের রস	কুঁড়ি ও ছাল কৃমিনাশক। ফলের খোসা ডায়রিয়া ও আমাশয় সারায়। হৃদরোগ ও অনিদ্রায় ডালিমের রস বেশ উপকারী
বরই	ফল, পাতা ও মূল	ফল হজম শক্তি বৃদ্ধি, বমির ভাব কমায়; কচি পাতা ফোঁড়া নিরাময় করে; ছাল ডায়রিয়া ও আমাশয় নিরাময় করে এবং মূলের নির্যাস জ্বর সারায়
বক ফুল	পাতা	পাতার নির্যাস -বুকের সর্দি, নাকের পানি পড়া কমায়।
ডুমুর	ফল, মূল, পাতা, ছাল ও আঠা	গ্রন্থি ফুলায় ডুমুরের আঠা বেশ উপকারী। পোকা-মাকড় যেমন ভিমরুল, বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতি হুল ফুটালে ডুমুর বেশ উপকারী। রক্ত বন্ধ ও ব্যথা বেদনা নিরাময়ে কার্যকরী।
সজনে	পাতা, মূলের ছাল ও বীজের তেল	সর্দি জ্বর, উচ্চ রক্ত চাপ কমাতে, টিউমারের ফোলা ও ব্যথা বেদনা কমাতে সজনে পাতা উপকারী। কুষ্ঠ রোগে সজনে বীজের তেল, দাদে মূলের ছাল কার্যকরী।
আম	কচি পাতা ও কচি আমের আঁটির শাঁস	আমাশয় হলে, বমি বমি ভাব হলে কচি আম পাতা উপকারী। অকালে চুল পড়া শুরু হলে কচি আমের আঁটির শাঁস কার্যকরী।
অশ্বত্থ	পাতা, ছাল মুকুল ও মূলের ছাল	ফোঁড়া হলে পাতা এবং পোড়া ক্ষতে ছাল কার্যকরী। ধাতু দূর্বলতায় মুকুল এবং মূলের ছাল বেশ উপকারী
তুলসী	বীজ ও পাতা	প্রসাবের জ্বালা পোড়ায় বীজ এবং হাম, বসন্তের দাগ মেলাতে, বাচ্চাদের সর্দি হলে এবং আমবাতে তুলসী পাতার রস উপকারী।
অশোক	ছাল, পাতা ও ফুল	ছাল ও পাতার রস ঋতুস্রাব, পাইলস, রক্ত আমাশয় নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ফুল যকৃতের অসুখ, সিফিলিস, গর্ভাশয়ের অসুখ নিরাময় করে। হৃৎপিন্ডের দূর্বলতায় এবং বিষাক্ত কীট দংশনে দংশিত স্থানের ফুলা ও জ্বালা যন্ত্রণা কমাতে ছালের রস বেশ উপকারী।
কালোজাম	জামের বীচি, পাতা, ছাল, শিকর	ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কালোজামের বীচি বেশ কার্যকরী। জামের পাতা, ছাল এবং শিকড় পেটের পীড়া ও বাতের জন্য উপকারী। দাঁতের মাড়ির ক্ষত সারাতে ছাল চূর্ণ এবং রক্তপাত বন্ধ করতে পাতা বেশ উপকারী।

নারিকেল	ফুল, ঝুনা নারিকেল, ডাব, কচি শিকড়, শিকড়	অজীর্ণ রোগে ঝুনা নারিকেল বাটা, কৃমি রোগে ডাবের পানি, কোষ্ঠ-কাঠিন্যে নারিকেলের পানি উপকারী। দাদ হলে ঝুনা নারিকেলের মালা, প্রোস্টেট গ্রন্থি ফুলে গেলে কচি শিকড় এবং দাঁতের মাড়ি ফুলে গেলে শিকড় কার্যকরী।
আমড়া	আঠা, ছাল, ফল	রক্ত আমাশয়ে আমড়ার আঠা; দূর্বল দেহের জন্য ছাল; অরুচি হলে ছাল এবং ফল কার্যকরী।
গাব	ফল ও পাকা	ডায়াবেটিস রোগ নিরাময় ও ক্ষত নিরাময় ফল এবং আমাশয় বা পেটের রোগ হলে ছাল কার্যকরী।
তেঁতুল	কাঁচা তেঁতুল, পাতা ও ফল	কাঁচা তেঁতুল রক্তপিত্ত ও কফনাশক, রুচিবর্ধক। বাতের ব্যথা, পুরানো আমাশয়, আমবাত, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে কোলেস্টেরল হ্রাস, মুখের ক্ষত সারাতে এবং অর্শরোগ নিরাময়ে পাতা ও ফল কার্যকরী। প্রস্রাবের সময় জ্বালা যন্ত্রণা হলে পাতার রস উপকারী।
বাবলা	পাতা ও ছাল	পাতলা পায়খানা, রক্তশ্রাব, সর্দি-কাশি এবং প্রস্রাবের অসুবিধা হলে পাতা ও ছাল কার্যকরী।
অশ্বগন্ধা	মূল	ক্ষয়রোগ, শ্বাস কষ্ট, পিত্তরোগ, রিকেট, অনিদ্রা এবং বাতে মূল চূর্ণ কার্যকরী।
সুপারি	ফল	রক্ত আমাশয় হল পাকা ফল এবং পঁচা ক্ষতে কাঁচা ফল; পেটে কৃমি হলে পাকা ফল, দাঁতে যন্ত্রণায় কাঁচা ও পাকা ফল কার্যকরী।
চিরতা	পাতা	জ্বর, কুষ্ঠরোগ, শ্বাস কষ্ট, ক্ষুধা মন্দ, পেটে গ্যাস, যকৃতে রোগ, চুলকানি হলে চিরতা ভেজা পানি উপকারী।
কালোমেঘ	পাতা	পেটের পীড়া, অরুচি, জ্বর, কৃমি, আমাশয়, কুষ্ঠরোগ হলে পাতার রস উপকারী।

মডিউল -১১
বাড়ীর আঙ্গিনায় হাঁস মুরগী ও গবাদি পশু পালন

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- পুষ্টি সরবরাহে হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুপালনের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা
- হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালনে পুষ্টি উন্নয়ন
- ডিম ও মাংসের পুষ্টিমান এবং উপকারিতা
- হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালনের উন্নত পদ্ধতিসমুহ
- হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর রোগ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রামে সকল পরিবারই কিছু না কিছু হাঁস-মুরগী ও গবাদি পালন করে থাকে। হাঁস-মুরগীর ডিম ও মাংস আমিষ সমৃদ্ধ সুস্বাদু খাদ্য। পারিবারিক খাদ্য চাহিদা পুরণের পাশাপাশি হাঁস-মুরগী পালনে কিছু বাড়তি আয়ের সুযোগ থাকে। বর্তমানে শহর, উপ-শহর ও গ্রামে বানিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগীর ও গবাদি পশুর খামার গড়ে উঠেছে, যেখানে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু (গরু, ছাগল, ভেড়া) পালন করা হয়। বাড়ীর আঙ্গিনায় দেশী ও উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুপালন করে পুষ্টি চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হতে পারে।

বসত-বাড়ীতে পারিবারিক পর্যায়ে হাঁস-মুরগী ও গরু ছাগল ভেড়া ও পালনের গুরুত্ব

- হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া) পালনের মাধ্যমে কর্ম-সংস্থান ও পরিবারের আয় বাড়ে।
- পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে এই প্রাণী সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে।

হাঁস-মুরগী হতে উৎপাদিত খাদ্যের পুষ্টিগুণ

হাঁস-মুরগীর ডিম ও মাংস এবং গবাদি পশু (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া) হল প্রানীজ আমিষের উৎস

(১) ডিমে ১৪ থেকে ১৬ ভাগ আমিষ থাকে, (প্রতি ১০০ গ্রামে)

(২) শিশুদের মস্তিক গঠনে ও বৃদ্ধি সাধনে আমিষের প্রয়োজন

(৩) প্রানীজ আমিষের জৈব গুণ উদ্ভিজ আমিষের থেকে বেশী

- হাঁস-মুরগী ভিটামিনের উৎস
- খনিজ লবনেরও উৎস, যেমন -

(১) হাঁস-মুরগীর ডিম ও মাংসে এবং গবাদি পশুর মাংসে প্রচুর পরিমানে লৌহ, দস্তা, তামা, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফেট থাকে।

(২) ডিম দৈহিক বৃদ্ধি ও শরীর গঠনে অপরিহার্য সব বয়সী মানুষের জন্য মুরগীর মাংস সহজপাচ্য এবং এটি আমিষের চাহিদা পূরণ করে।

(৩) গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী মা ও শিশুদের পুষ্টি উন্নয়নে হাঁস-মুরগীর ডিম ও মাংস বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়।

(৪) ডিম ও মাংসজাত উপাদানে তৈরী বিভিন্ন খাদ্য শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়, যাতে করে অতি সহজেই শিশু খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সংযোগ করা যায়, যা শিশুদের শরীর গঠন ও বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে।

(৫) দুধের আমিষে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ১০টি এমাইনো এসিড থাকে - নিয়মিত দুগ্ধ পান করলে শরীর নিজে তা উৎপন্ন করতে পারে।

(৬) গাভীর তুলনায় ছাগলের দুধে শতকরা ১৪-১৬ ভাগ পুষ্টিমান বেশী থাকে।

(৭) দুগ্ধজাত তৈরী বিভিন্ন খাবার শিশুদের বেশী পছন্দের তাই অতি সহজেই শিশু খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সংযোগ করা যায় যা শিশুদের শরীর গঠন ও বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে।

বসত-বাড়ীতে দেশী মুরগী পালনের কৌশল

গ্রামীণ পর্যায়ে সকল গৃহস্থ পরিবারেই দেশী মুরগী পালন করা হয়। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মুরগীর বাচ্চার মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা এবং দেশী মুরগীর দৈহিক ওজন ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

হাঁস ও মুরগী পালনের উন্নত পদ্ধতিসমূহ

(১.) মুরগী পালনে প্রযুক্তি ব্যবহারের / উন্নতি পদ্ধতির বর্ণনা :-

(ক) খামারের আকার অনুযায়ী প্রত্যেক খামারীর জন্য মোরগ-মুরগীর সংখ্যা নিম্নরুপ হতে হবে।

ছক ১০. খামারের আকার অনুযায়ী প্রত্যেক খামারীর জন্য মোরগ- মুরগীর সংখ্যা

খামারের আকার	মোরগ ও মুরগীর সংখ্যা	আবাদী জমির পরিমান
ছোট	১ টি মোরগ ও ৩ টি মুরগী জন্য ৪ বর্গফুট হিসাবে	৫০ শতাংশ
মাঝারী ও বড	১ টি মোরগ ও ৩ টি মরগী জন্য ৪ বর্গফুট হিসাবে	৫০ শতাংশের অধিক

(খ) প্রত্যেক খামারীকে তাদের মুরগীর খোয়াড় ছাড়াও মুরগীগুলি কে খাওয়ানোর জন্য বাঁশ,তারজালি অথবা বাঁশ দিয়ে তৈরী একটি ক্রিপ ফিডার তৈরী করতে হবে। এতে দুটো অংশ থাকবে । এক অংশে বাচ্চা এবং অন্য অংশে বয়স্ক মুরগীর সম্পূরক খাবার দিতে হবে।

(গ) ছোট খামারীর জন্য (ক্রিপ ফিডার) আকার ৪.২ ফুট (১.২৮ সে.মি) X ৫ফুট এবং বড় খামারীর জন্য ৫ ফুট)X ৩ ফুট হতে পারে। ক্রিপ ফিডারের তার জালি বা বাঁশের দরজার ফাঁকা ১.৫ ইঞ্চি থেকে ১.৭৫ইঞ্চি হতে হবে। যেন বাড়ন্ত বা বয়স্ক মুরগী ক্রিপ ফিডারে বাচ্চাদের জন্য খাবার দেওয়ার অংশে প্রবেশ করে বাচ্চাদের সম্পূরক খাবার খেতে না পারে।

- প্রতিটি মুরগীকে চড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি দৈনিক ৩৫ থেকে ৮০ গ্রাম খাদ্য খেতে দিতে হবে।
- ছোট খামারীগণ সারা বছর ১টি মুরগী বাচ্চা ফুটানোর জন্য ব্যবহার করবেন। বাকী ২টি মুরগী সারা বছর ডিম উৎপাদন করবে।

- মাঝারী ও বড় খামারীরগণ তাদের ৭ টি মুরগীর মধ্যে ২টি মুরগীকে ডিম ফুটানোর জন্য বসাবে। বাকী ৫টি সম্পূর্ণ বছর ডিম উৎপাদন করবে।
- ছোট বাচ্চাগুলিকে ৬ সপ্তাহ প্রয়োজনীয় সম্পূরক খাবার ক্রিপ ফিডারের ভিতর দিতে হবে। ৬ সপ্তাহের পর সম্পূরক খাবারের পরিমান কমিয়ে দিতে হবে। বাচ্চা ফুটার পর প্রথম ৪/৫ দিন বাচ্চার ক্রিপ ফিডারের ভিতর মাকেও খেতে দিতে হবে। কারণ ছোট বাচ্চারা প্রথম কয়েক দিন তাদের মাকে ছাড়া খায় না।
- দশ সপ্তাহ বয়সে প্রতিটি ছোট বাচ্চার জন্য সম্পূরক খাদ্যের পরিমান হবে দৈনিক ৩৫ থেকে ৪০ গ্রাম। ছয় থেকে দশ সপ্তাহ বয়সকালীন সময়ে ছোট বাচ্চাগুলো মুরগীর সাথে বাড়ীর আঙ্গিনায় চড়ে খেতে অভ্যস্থ হবে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল ও লাভ

- মুরগীর মৃত্যুর হার কমে যাবে। বিশেষ করে বাচ্চা মুরগীর ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার শতকরা ৫৫-৬০ ভাগ থেকে ২৫-৩০ ভাগে নেমে আসবে।
- এ পদ্ধতিতে দেশী মুরগী পালন করলে মুরগির দৈহিক ওজন শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ এবং ডিম উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে যাবে।
- সনাতন পদ্ধতিতে ৬-৭ টি দেশী মুরগী পালন করে একজন খামারী সাধারণত গড়ে ৬৫০০/- টাকা থেকে ৬৬০০/- টাকা আয় করতে পারেন।

খামারের স্থান নির্বাচন

উঁচু এবং ভাল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, চারিপার্শ্বে পঁচা ডোবা ও নর্দমা মুক্ত, অন্য খামার থেকে নিরাপদ দূরত্বে, বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুত যোগাযোগ ও লিটার (মুরগীর পায়খানা) সরিয়ে ফেলার ভাল ব্যবস্থা আছে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

ঘর পরিষ্কার ও জীবানু মুক্তকরণ

১ম দিন ঝাড়ু ও পানি দিয়ে পরিস্কার, ৩য় ও ৪র্থ দিন সকালে জীবানু নাশক (পভিসেপ, সুপারসেপ্ট,ক্লোরোক্স, আয়োসান, ভিরকন এস) দিয়ে জীবানু মুক্তকরণ করতে হবে। ঠোকরা-ঠুকরির প্রবণতা দূর করা এবং খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য দুইবার ডিবেকিং করা উচিত। প্রথমে ৬-১৪ দিনের মধ্যে এবং দ্বিতীয়বার ১২-১৬ সপ্তাহ বয়সে। উপরে ঠোঁটের সামনের দিকের অংশ যেটির কিছুটা সাদাটে এবং সুঁচালো হয় (ঠোঁটের ১/৩ ভাগ অংশ) সেটি কেটে বাদ দেয়া হয়।

প্রি-লেয়ার পালন সাধারনতঃ ১৮-২০ অথবা ১৮-২২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ডিম পাড়ার আগ পর্যন্ত প্রি-লেয়ার বলা হয়। ২০ সপ্তাহে ঝাঁকের ওজন লক্ষ্য মাত্রার কাছাকাছি থাকলে দিনের আলোর সাথে অতিরিক্ত সরবরাহের মাধ্যমে উদ্দীপনা দেওয়া প্রয়োজন। এ সময়ে ডিম উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ অতিক্রম করলে প্রি-লেয়ার ফিডের পরিবর্তে লেয়ার ফিড দিতে হবে। পুলেটকালীন সময়ের শুরুতে মুরগীর ঘরে ডিম পাড়ার বাক্স বসাতে হবে। ডিম পাড়া মুরগী ডিম পাড়াকালীন সময়ে আলোর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। আদর্শ ডিম উৎপাদনের জন্য গড়ে ১৬ ঘন্টা আলো প্রদান দরকার। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর খাবার ও পানি দিতে হবে। এ সময়ে মুরগীর ডিম পাড়ার জন্য ডিম পাড়ার বাক্স ঘরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে।

ছক ১১. বাচ্চার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা

সপ্তাহ	তাপমাত্রা (ফাঃ)
১ম	৯৫
২য়	৯০
৩য়	৮৫
৪র্থ	৮০
৫ম	৭৫
৬ষ্ঠ	৭০

ডিম পাড়ার বাক্স

প্রতি ৪-৫ টি মুরগীর জন্য ১টি ডিম পাড়ার বাক্স রাখতে হয়। ডিম পাড়ার বাক্সের পরিমাপ ১ফুট X ১ফুট X ১.২০ফুট (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) ঘনফুট হলেই চলবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গুনগত ও মান সম্পন্ন খাবার ক্রয়, সুষম খাবার তৈরী , খাদ্য উপাদান সমূহ সঠিকভাবে মিশানো এবং খাবার সংরক্ষণ করাই হচ্ছে খাদ্য ব্যবস্থাপনা।

বাচ্চার প্রথম খাবার

বাচ্চার খামারে পৌঁছানোর পরপরই গ্লুকোজ, পানিতে দ্রবীভূত ভিটামিন ও ভিটামিন সি মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটার পানিতে গরমের দিনে ৫০ গ্রাম ও শীতের দিনে ২৫-৩০ গ্রাম গ্লুকোজ,০.৫ গ্রাম পানিতে দ্রবীভূত মাল্টিভিটামিন, ০.৫ গ্রাম ভিটামিন সি এবং ০.৫ গ্রাম ইম্যুনো মডিউলেটর মিশিয়ে) চিক গার্ডের পানির পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। এরপর চিক গার্ডের ভিতরে বাচ্চা ছাড়তে হবে। বাচ্চা ছাড়ার আগে বাচ্চার ঠোঁট গ্লুকোজ ও ভিটামিন মিশানো পানিতে ডুবিয়ে পানি স্পর্শ করাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বাচ্চা ছাড়ার পর কমপক্ষে ৬ ঘন্টা ভিটামিন মিশানো পানি পান করার পর বাচ্চার পরিপাকতন্ত্র সচল হবে। প্রথম দিন গম বা ভূট্টার দানা বা বাচ্চার জন্য তৈরী খাবার যোগান দেয়া যায়। এরপর লেয়ার ষ্টারটার সরবরাহ করা হয়। প্রথমে প্রতিটি বাচ্চার জন্য ৬-৮ গ্রাম খাবার দরকার।

মুরগীর ভ্যাকসিন প্রয়োগ

মুরগীকে অসুখ থেকে রক্ষা করার জন্য বাচ্চা অবস্থা থেকে শুরু করে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত ভ্যাকসিন দিতে হবে। নিচে কত বয়সে ও কি ভাবে ভ্যাকসিন দিতে হবে তা বলা হল। নিকটস্থ পশুপালন কর্মীর নিকট থেকে জেনে নিন।

(২) বাড়ীর আঙ্গিনায় হাঁস পালন

বাংলাদেশে গ্রাম অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বাড়ীর পাশে পুকুর বা ডোবা থাকে। আবার বাড়ীর কাছাকাছি নদী, খাল, বিলে, হাওড় থাকে। আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। এই পুকুর বা ডোবা, নদী, খাল বা বিল এ হাঁস পালন করে পরিবারে পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও একই সাথে অল্প খরচে অধিক মুনাফা অর্জন করে আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়ানো যায়। হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে বাঁচতে পারে তাই একজন হাঁসপালনকারী কম খাদ্য খরচে সমগ্র বছরই লাভজনক ভাবে হাঁস চাষ করতে পারে। মুরগীর চেয়ে হাঁস পালনে উৎপাদন খরচ কম।

হাঁসের জাত ঃ বাংলাদেশে দেশী, খাকি ক্যাম্পবেল, জিংডিং, ইন্ডিয়ান রানার ও মাসকোভি জাতের হাঁস পালন করা হয়। দেশী জাতের হাঁস ডিম ও মাংস উৎপাদন করে। খোলা অবস্থায় এই হাঁস বছরে ৭০ থেকে ৮০ টি ও আবদ্ধ অবস্থায় বছরে প্রায় ২০০ থেকে ২০৫ টি ডিম দেয়। খাকি ক্যাম্পবেল জাতীয় হাঁস ডিম উৎপাদনকারী হাঁস, বছরে ২৫০ থেকে ৩০০ টি ডিম দেয়। জিংডিং জাতীয় হাঁস ডিম উৎপাদনকারী হাঁস, এরা বছরে প্রায় ২৭০টি ডিম পাড়ে।ইন্ডিয়ান রানার ডিম উৎপাদনকারী হাঁস এবং বছরে প্রায় ৩০০টি ডিম পাড়ে। মাসকোভি জাতের হাঁস মাংসের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসা প্রায় ৫ কেজি ও হাঁসি ৪ কেজি ওজনের হয়। বছরে গড়ে ১২০টি ডিম পাড়ে। ব্রডিং কালে বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী হয়। বাচ্চা ব্রডিং ঘরে নেয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পূর্বে থেকেই ব্রুডার জ্বালিয়ে ঘর গরম করে রাখতে হয়। যেন বাচ্চা রাখার সময়ে লিটারের তাপমাত্রা ২৮-৩১ সেঃ এর মধ্যে থাকে। দেখা গেছে প্রথম কয়েক দিন ঠান্ডা এবং কম তাপমাত্রার কারনে বাচ্চাগুলি নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়। তাই এ সময়ে বাচ্চার নিবিড় পরিচর্যা প্রয়োজন।

হাঁস পালন পদ্ধতি

৫ (পাঁচটি) পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা যায়। , যথাঃ-

(১) আবদ্ধ পদ্ধতি- এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলিকে পুরোপুরি ঘরের মধ্যে রেখে পালন করা হয়। এই পদ্ধতিতে তিনটি উপায়ে হাঁস পালন করা হয়।

(ক) ফ্লোরে পালন - এই পদ্ধতিতে মেঝেতে লিটার দ্রব্য দিয়ে হাঁস রাখা হয়। সমস্ত মেঝের ৪ ভাগের এক ভাগ খাবার দেওয়ার জন্য (খাবার ও পানির পাত্র রাখার) রাখা হয়। পানি বের করার জন্য নিষ্কাশণ ব্যবস্থা থাকে।

(খ) খাঁচায় পালন - এই পদ্ধতিতে একটির উপর একটি করে স্তরে স্তরে খাঁচা রাখা হয়। প্রতি খাঁচায় ২০-২৫ টি বাচ্চা রাখা হয়।

(গ) তারের জালের ফ্লোরে পালন - এই পদ্ধতিতে ঘরের ফ্লোর হতে উঁচু করে তারের জাল দেয়া হয় এবং খাঁচাগুলি ১-২ বর্গইঞ্চির ছিদ্রের হলে ভাল হয়। মাচার চারপাশে ১-২ বর্গফুটের বেড়া দিতে হবে। যেন বাচ্চাগুলি পড়ে না যায়।

(২) অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতি- এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলি রাতে ঘরে আবদ্ধ থাকে এবং দিনের বেলায় হাঁসগুলি ঘরের সামনের জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। চারণ হিসেবে ১০-১২ বর্গফুট জায়গার দরকার হয়। ঘরের সাথে ২০ ইঞ্চি প্রস্থের ও ৬-৮ ইঞ্চি গভীরতায় পানির একটি চৌবাচ্চা রাখতে হবে। যাতে হাঁসগুলি সহজে পানি খেতে পারে এবং ভাসতে পারে।

(৩) মুক্ত পদ্ধতি- এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলিকে কেবল রাতে ঘরে আটকে রাখা হয়। দিনের বেলায় হাঁসগুলি নিকটস্থ জলাশয়ে বিচরণ করে এবং খাদ্য খেয়ে থাকে, তাই খাদ্য খরচ নেই বললেই চলে।

(৪) হার্ডিং পদ্ধতি- এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলিকে (বাড়ন্ত ও পূর্ণ বয়স্ক) কোন প্রকার ঘরে রাখা হয় না। যে সব জায়গায় খাবার আছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সারাদিন পর রাতের বেলা কোন উচু জায়গাতে আটকে রাখা হয়। সকাল বেলা আবার ছেড়ে দেয়া হয়। কিছুদিন এক জায়গায় রাখার পর আবার অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এক জন লোক একবারে ১০০ থেকে ৫০০ হাঁস চড়াতে পারে।

ল্যানটিং পদ্ধতি - এই পদ্ধতিতে বড় বড় বিল, হাওড় বা জলাশয়ে হাঁস পালন করা হয়। এক্ষেত্রে নদী, হাওড়, ইত্যাদির আশে পাশে ঘর তৈরী করে হাঁস পালন করা হয় । প্রতিটি দলে ১০০-২০০ হাঁস থাকে।

হাঁস পালনের জন্য বাসস্থান

হাঁস পালনের জন্য খোলামেলা উঁচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা এবং ড্রেন কাটার সুবিধা ও ঘাস জন্মাতে পারে এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে। ঘরের আশেপাশে গাছ ও জঙ্গল থাকা এবং মুরগীর খামারের পাশে হাঁস পালনের জায়গা করা ঠিক নয়। হাঁসের সংখ্যার উপর লক্ষ্য রেখে ঘর তৈরী করতে হবে। ঘরের তাপ মাত্রা ৫৫ থেকে ৭৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট ও আর্দ্রতা ৭০% এর মধ্যে রাখতে হবে। ডিম পাড়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো থাকতে হবে এবং ঘর শুষ্ক থাকার জন্য বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য তারের জালের বা বাঁশের বেড়ার ছিদ্র গুলো বড় রাখতে হবে। ঘরের মেঝে আর্দ্রতা ও স্যাঁতসেতে মুক্ত হতে হবে। ঘরে পানি সরবরাহের জন্য ২০ইঞ্চি প্রস্থ ও ৮-৯ ইঞ্চি গভীরতায় তৈরী একটি স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। হাঁসের রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থার জন্য সময় মত টিকা দিতে হবে ।

গবাদি পশু (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া) পালনে ঘরের অবস্থান ও ব্যবস্থাপনা

- উঁচু, শুকনা ও পানি জমে না এরকম জায়গা হতে হবে।
- প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঘরের মেঝে সব সময় শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখতে হবে।
- ছাগলের জন্য মাচার ঘর সব সময়ে উপযোগী।
- ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি এবং দক্ষিন দিক খোলা রেখে তৈরী করতে হবে।
- ঘরের দুই পাশে জানালা রাখতে হবে।
- ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উচু করে চারপাশ কিছুটা ঢালু করে দিতে হবে।
- মাটির মেঝে হলে পর্যাপ্ত বালু দিতে হবে।
- প্রতিদিন ভোরে ঘর পরিষ্কার করতে হবে এবং ঘরের জানালা খুলে দিতে হবে।
- ঘরের পাশে ছায়া প্রদানকারী ফলজ গাছ থাকা দরকার।
- শীতকালে ঘরের মেঝেতে খড় বা বিচালী বিছিয়ে দিতে হবে।

মডিউল -১২

পুষ্টি উন্নয়নে মাছ চাষ

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- খাদ্য ও পুষ্টির উৎস হিসেবে মাছ চাষের গুরুত্ব সম্বন্ধে জানা
- মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব জানা
- মাছের পুষ্টিমান ও সুস্বাস্থের জন্য মাছের গুরুত্ব জানা

ভূমিকা

গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বসত-বাড়ীর পার্শ্বে পুকুর থাকে। কোন কোন বাড়ী-ঘর নদীর পাড়েও হয়ে থাকে। অনেক সময় বাড়ীর পাশে খাল, বিল ও হাওড় থাকে। এসব জলাশয়ে মাছ উৎপাদন হয়। আমাদের দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু মাছ উৎপাদনের জন্য উপযোগী। পুকুর বা ডোবা, নদী, খাল ও বিলে মাছ উৎপাদন করে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটানো সম্ভব। একই সাথে পরিবারের জন্য অর্থ অর্জন করে আর্থিক স্বচ্ছলতাও বাড়াতে পারে। মাছ প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে বাঁচতে পারে তাই একজন মাছ চাষী কম খাদ্য খরচে সারা বছরই লাভজনকভাবে মাছ চাষ করতে পারেন।

মৎস্য চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব জানা

দেখা গেছে, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪.৩৭% মৎস্য খাত থেকে আসে। কৃষিজ প্রবৃদ্ধির প্রায় এক চর্তুথাংশ (২৩.৩৭%) মৎস্য উপ-খাতের অবদান। দেশের প্রায় ১৬৫ লক্ষ লোক মৎস্যের সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত ও জীবিকা নির্বাহ করে।(মৎস্য অধিদপ্তর, ২০১৪)

দেশের রপ্তানী আয়ের ২.০১% মাছ ও মাছ জাতীয় পণ্য রপ্তানী করে আয় করা হয়। (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০১৪)

এছাড়া মাছের বর্জ্য যেমন আঁইশ, চামড়া, হাড়,কাটা, পটকা, পাখনা, দাঁত, লেজ, নাড়ি-ভুড়ি ও পিত্তথলি ইত্যাদি যেগুলো আমরা খাই না সেগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যেমন--

(১) মাছের আঁইশ আঠা বা গাম, প্রসাধন সামগ্রী, ঔষধ, অলংকরণ, সজ্জা ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

(২) ঔষধ ও প্রাণ রসায়ণ দ্রব্যাদি তৈরীতে যেমন, মাছের পিত্তথলি, বাইসল্ট ও ইনস্যুলিন তৈরীতে,

(৩) সামুদ্রিক মাছ, বিশেষ করে হাঙ্গরের পাখ্না থেকে স্যুপ, এবং যকৃত হতে লিভার অয়েল তৈরী করা হয় যা ভিটামিন -এ ও ভিটামিন - ডি সমৃদ্ধ।

(৪) চিংড়ি ও কাঁকড়ার খোসা ঔষধ ও বিভিন্ন প্রানীর খাদ্যে খনিজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৫) মাছের চামড়া থেকে ওয়ালেট, ব্যাগ জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

(৬) মাছের তেল ভিটামিন সমৃদ্ধ । এই তেল অনেক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্য ও পুষ্টির উৎস হিসেবে মাছ ও মাছ চাষের গুরুত্ব

বাঙ্গালীদের খাদ্যের উৎস হিসেবে মাছ অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ছোট বড় নানা রকমের মাছ যেমন রুই, কাতল,মৃগেল, ইলিশ ইত্যাদি বড় মাছ এবং ছোট ও মাঝারি আকারের মাছ যেমন- পুঁটি, খলিসা, কাঁচকি, মলা, চেলা, শিং , মাগুড়, টাকি, কৈ ইত্যাদি সব বাঙ্গালীর পছন্দ। এই সব মাছের পুষ্টিমানও অনেক। বসত-বাড়ির আশেপাশের পুকুর ডোবা, খাল, বিল ও হাওড়ে এ সমস্ত মাছ চাষ করা বা সংরক্ষন করা যায় । বড় মাছের তুলনায় ছোট মাছের পুষ্টিমান বেশী। তাই প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা মিটাতে আমাদের প্রচুর নানা ধরনের মাছ খেতে হবে।

মাছের পুষ্টিমান ও সুস্বাস্থের জন্য মাছের গুরুত্ব জানা

শরীর সুস্থ থাকার জন্য যে ছয়টি উপাদান যেমন- আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবন ও পানি আমাদের প্রয়োজন তার সবই মাছের মধ্যে আছে।

(ক) আমিষের উৎস হিসাবে মাছ

- বাংলাদেশে প্রানীজ আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রানীজ আমিষের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আমরা মাছ থেকে পেতে পারি।
- তাজা মাছে শতকরা ৪-২২ ভাগ আমিষ থাকে। মাছের আমিষ অত্যন্ত উন্নত মানের। মানব দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ১০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড মাছের দেহে আছে। যেমন- লাইসিন, আরজিনিন,হিস্টিডিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ভেলিন, থ্রিওনিন, মিথিওনিন, ফিনাইল অ্যালানিন ও ট্রিফটোফ্যান। মাছের আমিষ সহজপাচ্য।

(খ) স্বাস্থ্যসম্মত তেল বা চর্বির (লিপিড) উৎস হিসাবে মাছ

- গবেষকদের মতে সামুদ্রিক ও লোনা পানির মাছ বেশী পরিমানে খেলে হৃদরোগের আশংকা কমে যায়। যারা উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগে ভুগছে তাদের জন্য মাছের তেল খুবই উপকারী। সামুদ্রিক মাছে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড শুধুমাত্র রক্তচাপ ও হার্ট-এ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় না বরং মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তথা মস্তিস্ক ও চোখের রেটিনার গাঠনিক উন্নয়নে ভিত্ রচনা করে।
- ওমেগা -৩ ফ্যাটি এসিড গেটে বাত, হাঁপানি, ইত্যাদির যন্ত্রনাও কমায়। এছাড়া লোনা পানির মাছ দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত যে রাসায়নিক পদার্থ দেহে জ্বালা-যন্ত্রনার সৃষ্টি করে তার উৎপাদন বন্ধ করে দেয়।
- মাছের ওমেগা -৩ ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ তেল মস্তিষ্ক কোষসমুহের মধ্যে অতি তৎপর সংকেত বহণকে লঘু করে এবং মুডের উত্থানকে শান্ত করে থাকে।
- নিয়মিত মাছের তেল গ্রহনে যে কোন ধরণের অপ্রাইটিসের বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

(গ) ভিটামিনের উৎস হিসাবে মাছ

- ছোট মাছ বিশেষ করে মলা, ঢেলা, কাঁচকি, পুঁটি, খলসে, ডানকানা, চাপিলা ইত্যাদি মাছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন -এ পাওয়া যায়। নিয়মিত এ মাছ খেলে রাতকানা রোগের হাত থেকে মুক্ত থাকা যায়।
- ৪-৬ বছরের একটি শিশুকে যদি দৈনিক ২৩ গ্রাম ঢেলা মাছ খাওয়ানো যায় তাহলে তার শরীরের ভিটামিন -এ এর চাহিদা প্রায় পূরণ হয়ে যায় এবং সে অপুষ্টি জনিত অন্ধত্বতে থেকে রেহাই পেতে পারে।
- মাছের যকৃত ভিটামিন -এ ও ভিটামিন- 'ডি' তে সমৃদ্ধ যা হাড়, দাঁত ও চোখের জন্য প্রয়োজনীয়।
- মাছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন-বি রয়েছে, বিশেষ করে ভিটামিন -বি ও নিয়াসিন । এগুলো চর্ম ও স্নায়ুবিক রোগে বিশেষ উপকারী।

খনিজ লবনের উৎস হিসাবে মাছ

- মাছে প্রচুর পরিমানে খনিজ লবন যেমন- লৌহ, তামা, দস্তা, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম , ফসফরাস আছে।
- ছোট মাছ বিশেষ করে টেংরা, কৈ, শিং ও মাগুর শরীরের লৌহের চাহিদার অভাব পূরণ করে থাকে।
- সন্তান সম্ভবা মা বা দুগ্ধদানকারী মায়েদের(যারা বুকের দুধ খাওয়ান) জন্য ছোট মাছ আদর্শ খাবার।
- ছোট মাছে প্রচুর পরিমানে ক্যাল্সিয়াম ও ফস্ফরাস থাকে। পরিবারের সকল সদস্যগনকে ক্যলসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব পূরনে ছোট মাছ খাওয়া দরকার। শিং ও মাগুর মাছ রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় এলাকার মাছে প্রচুর পরিমানে আয়োডিন থকে। তাই সামুদ্রিক মাছ পরিবারকে আয়োডিনের অভাব জনিত রোগ থেকে বাঁচাতে পারে।
- সামুদ্রিক মাছের ফ্লোরাইড দাঁতের ক্ষয়রোধ করতে সাহায্য করে।

জীব-বৈচিত্র সংরক্ষনে মাছের গুরুত্ব

- মাছ পুকুর ও জলাশয়ের ফাইটোপ্লাংটন খেয়ে বেঁচে থাকে। এরা ফাইটোপ্লাংটন খাওয়ার ফলে অতিরিক্ত ব্লোম নিয়ন্ত্রন হয়। এতে পানির গুনাবলী বজায় থাকায় সিলভার কার্প মাছকে Water Quality Manager বলা হয়।
- কচ্ছপ, পটকা মাছ পানির দূষন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ঝিনুক পানির ঘোলাত্ব দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- ওয়েষ্টার পানিতে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া দমনে পারদর্শী।
- এ ছাড়াও স্কাভেন্জার মাছ হিসেবে পরিচিত মৃগেল, কার্প ও চিংড়ি মাছ পুকুরের তলদেশে পরিবেশ দূষনমুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ সম্পদকে উৎপাদনমুখী করার জন্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে যার যেখানে যতটুকু জলাশয় আছে সেখানে মাছ চাষ করতে হবে ও মাছ চাষকে উৎসাহিত করতে হবে।

সূত্র ঃ মৎস্য চাষ প্রশিক্ষন ম্যানুয়াল, ইউএস এইড ও এফএও, ফেব্রুয়ারী ২০১৫

মডিউল -১৩
পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- খাদ্য প্রস্তুত,খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়মসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা।
- পুষ্টি অপচয় রোধ করা।
- পরিচ্ছন্নভাবে খাদ্য তৈরী ও খাদ্য নিরাপদ রাখার নিয়মাবলী জানা।
- ঘরোয়াভাবে প্রধান প্রধান খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ও সংরক্ষণের যে সকল পদ্ধতি সমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে তা এবং খাদ্য সংরক্ষণের উপকারিতার বর্ননা ।
- বছর ধরে পুষ্টিকর শাক-সবজি ও ফল-মূলের সরবরাহের কৌশলসমূহ জানা।
- ব্যবহারকারীদের খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ভেজাল এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয়ে জানা।

ভূমিকা

কোন খাদ্যশস্যকে অবিকৃত এবং পঁচন ক্রিয়া রোধ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আহারোপযোগী করে রাখাকেই সংরক্ষণ বলা হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

- খাদ্যের অপচয় হ্রাস করা;
- খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ;
- সারা বছর মৌসুমী খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্য শস্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা;
- আয় বৃদ্ধি করা;
- কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করা।

সংরক্ষণের পদ্ধতি

ক. রৌদ্রে শুকিয়ে
খ. লবণ, চিনি, তেল ও সিরকা/ভিনেগার ব্যবহার করে
গ. আগুনে ফুটিয়ে
ঘ. বরফে রেখে বা অতিরিক্ত ঠান্ডা ব্যবহার করে।

(ক) রৌদ্রে শুকিয়ে

ফল-মূল, শাক-সবজি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য রৌদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। বড় ডালা বা বাঁশের চালুনীতে হালকা ভাবে ফল বা সবজি ছড়িয়ে দিয়ে শুকাতে হয়। পর পর ৪-৫ দিন রৌদ্রে শুকিয়ে ঝর ঝরে করে নিতে হয়। শুকিয়ে গেলে হালকা হয়ে যায়। এরপর পরিস্কার ও শুকনো পাত্রে রেখে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে। পলিথিনের ব্যাগে রেখে মোমের আগুনে মুখ আটকিয়ে রাখা যায়।

(খ) লবণ, চিনি, তেল ও সিরকায় সংরক্ষণ

বিভিন্ন ফল রৌদ্রে শুকিয়ে তেলে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। তেলে ডুবে থাকার কারণে ক্ষতিকারক কিছু ফলকে আক্রমণ করতে পারে না। ১৫% লবণ মিশানো কাঁচা আম, জলপাই, বড়ই, আমলকী, তেঁতুল প্রভৃতি রৌদে শুকিয়ে তেলের সাহায্যে সংরক্ষণ করা যায়। তেলের আচারে ফলকে ডুবিয়ে রাখতে হয় অর্থাৎ ফলের চেয়ে তেল বেশী হতে হবে। তাছাড়া লবণ মিশিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা যায়। কারণ লবণ মিশালে পঁচনশীল জীবাণু বিস্তার ঘটাতে পারে না। খাদ্য-শস্য রৌদ্রে শুকিয়ে সিরকা বা ভিনেগারে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। ভিনেগার সংরক্ষণের কাজ করে। ফলে জীবাণু মুক্ত থাকে।

(গ) আগুনে ফুটিয়ে সংরক্ষণ

আনারস, পেয়ারা, পাকা আম, জাম্বুরা, টমেটো প্রভৃতির রস চিনি দিয়ে ফুটিয়ে জেলি বা জ্যাম বানিয়ে অনেক দিন রেখে খাওয়া যায়।

(ঘ) বরফে রেখে সংরক্ষণ

হিমাগারে, বরফে বা শীততাপ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শাক-সব্জি ও ফল রান্না করা খাবার ফ্রীজে তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। তাজা ফল ও সব্জি পরিস্কার করে মুছে পলিথিনের ব্যাগে করে রাখা যায়।

নিচে কয়েকটি ফল ও সব্জির জেলী, জ্যাম ও মোরব্বা তৈরীর পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো ঃ

ছক ১২. পেয়ারার জেলী প্রস্তুত তৈরীর উপকরণ ও তার পরিমাণ

উপকরণ	পরিমাণ
পেয়ারার রস	৬০০ গ্রাম
চিনি	৪০০ গ্রাম
সাইট্রিক এসিড	৫ গ্রাম
পটাশিয়াম মেটাবাইসালফেট	০.৫ গ্রাম

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি ঃ হ্যান্ড রিফ্রেক্টোমিটার, সস্‌পেন, ছুরি অথবা বটি, বোতল, চামচ, পাতলা কাপড় ইত্যাদি ।

প্রস্তুত প্রনালী

- পরিপুষ্ট কিন্তু বেশী পাকা নয় এমন পেয়ারাগুলি জেলীর জন্য বাছাই করে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে নিন;
- ধুয়ে নেয়া পেয়ারাগুলিকে এবার ছোট ছোট টুক্‌রা করে কেটে সম পরিমাণ পানিতে সিদ্ধ করুন। সিদ্ধ করার সময় কাঠের হাতল দিয়ে টুক্‌রাগুলিকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে দিন যাতে এই গুলোতে আঁঠালো ভাব সৃষ্টি হয়;
- পেয়ারা সাধারণতঃ ৩০-৩৫ মিনিট সিদ্ধ করলেই নিঃসৃত রস জেলী তৈরীর উপযোগী হয় এবং
- এরপর পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে রস আলাদা করে নিন। এ রসের সাথেই বের হয়ে আসে পেক্‌টিন ও এসিড। নিঃসৃত পেক্‌টিন ও এসিড জেলী তৈরীতে সাহায্য করে। রস যতই স্বচ্ছ হবে জেলী ততই উজ্জ্বল হবে।

জেলী প্রক্রিয়াজাতকরন

- উপকরণের পরিমাণ অনুযায়ী রস, চিনি, সাইট্রিক এসিড আলাদা করে ওজন দিন;
- এবার রসের সাথে চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিন। রান্নার সময় অনবরত নাড়াচাড়া করতে হবে;
- রিফ্রেক্টোমিটার দিয়ে মিশ্রনের গাঢ়ত্ব পরীক্ষা করুন এবং মিশ্রণটি ৫৮^{O} ব্রিক্স আসা পর্যন্ত রান্না করুন;
- এরপর সাইট্রিক এসিড যোগ করুন এবং মিশ্রনটি ৬৫^{O} ব্রিক্স আসা পর্যন্ত রান্না করুন। রিফ্রেক্টোমিটার এর অনুপস্থিতিতে শিটিং পরীক্ষার মাধ্যমে জেলী হয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব। শিটিং পরীক্ষার পদ্ধতি হলো-চামচ মিশ্রণের মধ্যে ডুবানো হয় এবং ঠান্ডা করে চামচ বেয়ে মিশ্রণটিকে পড়তে দেয়া হয়। যদি এটা একধারে না পড়ে শিটের আকারে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে জেলী হয় গেছে;
- টিএসএস ৬৫^{O} ব্রিক্স হলে বা শিটিং পরীক্ষার জেলী প্রস্তুত হওয়ার কাছাকাছি বুঝা গেলে নির্ধারিত পরিমাণ পটাশিয়াম মেটাবাইসালফেট সামান্য পানিতে গুলিয়ে মিশ্রণের সাথে যোগ করুন এবং সামান্য একটু জ্বাল দিয়ে অর্থাৎ ৬৬^{O} ব্রিক্স হলে জ্বাল দেয়া বন্ধ করুন এবং
- জেলী জীবানুমুক্ত বোতলে ঢেলে ছিপি এঁটে দিন। ঠান্ডা হওয়ার পর জেলীর উপরে মোম গলিয়ে দিন। মোম জমে গেলে ছিপি এঁটে দিয়ে জেলীর বোতলগুলি শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন।

বোতল জীবাণুমুক্তকরণ

জেলীর বোতলগুলিকে সস্‌পেনে পানি নিয়ে তাতে ৩০-৩৫ মিনিট ফুটালে জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। জেলী তৈরীর সময়ই বোতলগুলিকে জীবাণু মুক্ত করা যায়। বোতলগুলিকে গরম পানিতে রাখাই উত্তম। জেলী তৈরী হয়ে গেলে বোতলগুলিকে পাত্র থেকে উঠিয়ে পানি নিংড়িয়ে জেলী ভরা উত্তম।

ছক ১৩. আনারসের জ্যাম তৈরীর উপকরণ ও তার পরিমাণ

উপকরণ	পরিমাণ
আনারসের পাল্প	৫৫০ গ্রাম
চিনি	৪৫০ গ্রাম
সাইট্রিক এসিড	৫ গ্রাম
পেকটিন	১০ গ্রাম
পটাশিয়াম মেটাবাইসালফেট	০.৫ গ্রাম

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

হ্যান্ড রিফ্রেক্টোমিটার, সস্‌পেন, বোতল, চামচ, ইত্যাদি

প্রস্তুত প্রণালী

- পাকা আনারস পরিস্কার পানিতে ধুয়ে ছুড়ি দিয়ে কেটে উপরের ত্বক ফেলে দিন;
- ছুরির অগ্রভাগ দিয়ে আনারসের চোক্ তুলে ফেলুন। এরপর লম্বালম্বি কেটে বেশ কয়েকটি ফালি করুন এবং ভিতরের শক্ত অংশ ফেলে ছোট ছোট টুক্‌রা করে কেটে নিন এবং
- টুক্‌রাগুলি ব্লেন্ডিং মেশিনে ব্লেন্ড করে পাল্প তৈরী করে নিন। এভাবে জ্যাম তৈরীর জন্য পাল্প প্রস্তুত হয়ে গেল।

জ্যাম প্রক্রিয়াজাতকরণ

- উপকরণের পরিমাণ অনুযায়ী পাল্প, চিনি, সাইট্রিক এসিড ও পেক্টিন আলাদা করে ওজন নিন;
- পাল্পের সাথে চিনি ও পেকটিন মিশিয়ে মিশ্রণ জ্বাল দিন
- আনারস থেকে জ্যাম তৈরীর পরবর্তী ধাপগুলি পেয়ারার জেলী প্রক্রিয়াকরণের ধাপগুলির অনুরূপ।

চাল কুমড়ার মোরব্বা ও ক্যান্ডি তৈরীর পদ্ধতি

- সম্পূর্ণ পুষ্ট অর্থাৎ আংগুল দিয়ে চাপ দিলে শক্ত মনে হয় এমন ধরনের চাল কুমড়া মোরব্বা এবং ক্যান্ডি তৈরীর জন্য নির্বাচন করুন;
- ভালো করে পানিতে ধুয়ে চালকুমড়ার ছাল ফেলে দিন। এবার যথাযথ আকারে (বর্গাকার, আয়তাকার/ত্রিভুজাকার) কেটে নিন এবং টুক্‌রাগুলির অসার অংশ সরিয়ে নিন;
- টুক্‌রাগুলি ৩-৪ ঘন্টা ধরে ২% চুনের পানিতে রেখে দিন। এরপর টুক্‌রাগুলিকে একটি পাত্‌লা কাপড়ের থলিতে নিয়ে ফুটন্ত পানিতে ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। পানিতে সামান্য পরিমাণ ফিট্‌কারি মিশালে স্লাইসগুলি আরো শক্ত ও সাদা হয়;
- এরপর টুক্‌রাগুলিকে ছিদ্র করে নিন;
- এক কেজি স্লাইসের জন্যে ০.৫ কেজি চিনি নিয়ে তা থেকে কিছু পরিমাণ চিনি একটি প্যানের উপরে সমানভাবে বিছিয়ে ছিদ্র করা টুক্‌রাগুলি চিনির স্তরের উপর বিছিয়ে অবশিষ্ট চিনি সহযোগে এগুলিকে ঢেকে দিন
- প্যানটি ঢেকে দিয়ে কয়েক ঘন্টা এভাবে রেখে দিলে চালকুমড়া থেকে পানি বেরিয়ে চিনিকে গলিয়ে ফেলবে;
- এবার টুক্‌রাগুলি আলাদা করে নিয়ে প্রাপ্ত সিরা এবং আরো ০.৫ কেজি চিনি ও কিছু সাইট্রিক এসিড গরম সিরার সাথে যোগ করুন। গাদ্, ময়লা ফেলে দিয়ে সিরা ছেঁকে নিন;
- চালকুমড়ার টুক্‌রাগুলি সিরার মধ্যে জ্বাল দিন
- সিরার ঘনত্ব মধুর মতো ঘন হয়ে এলে জ্বাল দেয়া বন্ধ করুন;
- এবার টুক্‌রাগুলি তুলে নিয়ে একটি ট্রেতে ছড়িয়ে ৪-৫ দিন শুকিয়ে নিন;
- এরপর পরিস্কার জীবাণু মুক্ত কন্‌টেইনারে অথবা পলিপ্রোপাইলিন প্যাকেটে সংরক্ষণ করুন।

আচার

রকমারি মশলা মিশানো ফল বা সব্‌জি খাওয়ার তেল বা ভিনেগারে ডুবানো অবস্থায় প্রস্তুত খাদ্যকে আচার বলা হয়। আচারে প্রায় শুকানো করা ফল বা সব্‌জির সাথে সরিষার তেল এবং ভিনেগার মিশিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ফল বা সবজির জলীয়াংশ বেশ কমে গিয়ে তেল বা ভিনেগার সম্পৃক্ত হয়ে উঠলে এদের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে পঁচন সৃষ্টিকারী জীবানুগুলির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণতঃ কাঁচা আম, আমড়া, জলপাই, চাল্‌তা, গাজর, রসুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, সাত্‌কড়া, ইত্যাদি থেকে আচার তৈরী করা হয়। নিম্নে কয়েকটি ফল ও সব্‌জির আচার তৈরীর পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো ঃ

ছক ১৪. বেগুনের টক্-মিষ্টি আচার তৈরীর উপকরণ ও তার পরিমাণ

উপকরণ	পরিমাণ	উপকরণ	পরিমাণ
বেগুন/পটল	১ কেজি	চিনি	২০০ গ্রাম
শুক্‌নো মরিচের গুঁড়া	৩০ গ্রাম	মেথির গুঁড়া	৫ গ্রাম
রসুন	৩০ গ্রাম	এসিটিক এসিড	১৫ মি. লি.
আদা	৬০ গ্রাম	লবণ	পরিমাণ মতো
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম	জিরা	২.৫ গ্রাম
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম	সরিষার তেল	৪০০ মি. লি.

তৈরীর পদ্ধতি

পিকল্‌স এর জন্য সরু ও লম্বা বেগুন হলেই ভালো হয়। বেগুনের বোঁটা ফেলে দিয়ে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে ১ কেজি পরিমাণ নিয়ে নিন এবং উপকরণের পরিমাণ অনুসারে অন্যান্য দ্রব্য নিন;

- বেগুনগুলি ৫ সে. মি. লম্বা টুক্‌রা করে কেটে এবং টুক্‌রাগুলি লম্বালম্বি ভাবে মাঝ বরাবর কেটে দু'টি ফালি করুন;
- টুক্‌রাগুলি সবটুকু তেলের মধ্যে ভেজে নিন
- আদা ও রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিঃ লিঃ ১% এসিটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেস্ট তৈরী করে নিন। কাঁচা মরিচের বোঁটা ছাড়িয়ে ৪% এসিটিক এসিড দ্রবণে ভিজিয়ে রাখুন;
- শুক্‌না মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া আদা রসুনের পেস্টের সংগে মিশিয়ে

নিন এবং মিশ্রণটি বেগুন ভেজে নেয়ার পর কড়াই এ পরিত্যক্ত তেলের মধ্যে কষিয়ে নিন;

- ভাজার সময়ে বেগুনের টুক্‌রা, কাঁচামরিচ, চিনি এবং মেথি ও জিরার গুঁড়া একে একে যোগ করুন;
- সবশেষে লবণ এবং অবশিষ্ট এসিটিক এসিড অর্থাৎ ১৪ মিলিলিটার গ্লাসিয়াল এসিটিক এসিড যোগ করুন।

ছক ১৫. আমড়ার আচার তৈরীর উপকরণ ও তার পরিমাণ

উপকরণ	পরিমাণ	উপকরণ	পরিমাণ
আমড়া	১.০ কেজি	সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম
রসুন	৩০ গ্রাম	জিরার গুঁড়া	২.৫ গ্রাম
আদা	৬০ গ্রাম	মেথির গুঁড়া	৫ গ্রাম
চিনি	১০০ গ্রাম	এসিটিক এসিড	১৫ মিঃ লিঃ
শুক্‌না মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম	লবণ	৩০ গ্রাম
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম	সরিষার তেল	৪০০ মি. লি.

তৈরীর পদ্ধতি

- আমড়ার আচারের জন্য ভালো আমড়া বেছে নিন। পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বটি বা চাকু দিয়ে আমড়ার উপরের ছাল বা ত্বক ছিলে ফেলুন;
- আমড়াগুলি ৩-৪ সেঃ মিঃ লম্বা করে কেটে নিন;
- এক কেজি আমড়ার টুক্‌রার সাথে ১ চামচ বা ৪% হিসেবে ৪০ গ্রাম লবণ ও ১ চামচ হলুদ দিয়ে মেখে ২৪ ঘন্টা রেখে দিন;
- এরপর আমড়াগুলি উঠিয়ে বাঁশের চালুনী বা ট্রেতে ১-২ ঘন্টা রৌদ্রে শুকিয়ে নিন;
- টুক্‌রাগুলি ওজন করা সবটুকু তেলের মধ্যে ভেজে নিন;
- আদা ও রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলি লিটার ১% এসিটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেস্ট তৈরী করুন;
- শুক্‌না মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া আদা রসুনের পেস্টের সঙ্গে মিশিয়ে আমড়া ভেজে নেয়ার পর কড়াই এর পরিত্যক্ত তেলের মধ্যে ভালোভাবে কষিয়ে নিন;
- এবার কষানো মশ্‌লার সাথে ভাজা আমড়ার টুক্‌রা, চিনি, মেথী, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া যোগ করুন। পরিশেষে লবন ও অবশিষ্ট এসিটিক এসিড অর্থাৎ ১৪ মিঃ লিঃ গ্লাসিয়াল এসিটিক এসিড যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে সামান্য সময় জ্বাল দিন।
- এরপর চুলা থেকে নামানোর পর গরম অবস্থায় জীবাণু মুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিন।

আমড়াগুলি কেটে সামান্য পানি দিয়ে সিদ্ধ করে এবং পরে পানি নিংড়িয়েও তেলের মধ্যে ভাজা যায়। মোটামুটিভাবে উপরের বর্ণিত পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফল ও সব্‌জি থেকে আচার তৈরী করা হয়।

চাট্‌নি

সবসময়ে লবণ ও চিনি মিশিয়ে চাটনি তৈরী করা হয়। বিভিন্ন মশ্‌লা মিশিয়ে চাট্‌নির স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়ানো যায়। সাধারণতঃ বরই, তেঁতুল, জলপাই, আম, আমড়া ও চাল্‌তা ইত্যাদির চাট্‌নি করা হয়। এখানে জলপাইয়ের মিষ্টি চাট্‌নি তৈরীর পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো ঃ

ছক ১৬. জলপাই এর মিষ্টি চাট্‌নি তৈরীর উপকরণ ও তার পরিমান			
উপকরণ	পরিমাণ	উপকরণ	পরিমাণ
জলপাই	১.০ কেজি	এলাচের গুঁড়া	০.৫ গ্রাম
গুড় অথবা চিনি	৮০০ গ্রাম	দারুচিনির গুঁড়া	৩ গ্রাম
লবণ	৩০ গ্রাম	লং এর গুঁড়া	১ গ্রাম
রসুন	১৫ গ্রাম	গোলমরিচের গুঁড়া	১ গ্রাম
আদা	২০ গ্রাম	সরিষার তেল	৫০ মিঃ লিঃ
মরিচের গুঁড়া	৫ গ্রাম	সোডিয়াম বেন্‌জয়েট	০.৭৫ গ্রাম
জিরার গুঁড়া	২ গ্রাম	মৌরী	৫ গ্রাম
সরিষার গুঁড়া	১০ গ্রাম	ভিনেগার/এসিটিক এসিড	১২০/০৫ সিসি

তৈরীর পদ্ধতি

- কাঁচা অথচ পরিপক্ক জলপাই পানিতে ধুয়ে দুপাশ দিয়ে কেটে কড়াইয়ে দিন;
- কড়াইটি চুলায় বসিয়ে সামান্য পানি যোগ করে জলপাইগুলি সিদ্ধ করুন এবং কাঠের হাতল দিয়ে নাড়িয়ে বীচি থেকে পাল্প আলাদা করুন;
- অর্ধেক পরিমাণ বীচি সরিয়ে পাল্পের সাথে চিনি ও লবণ যোগ করুন;
- রসুন ও আদার পেস্ট তৈরী করুন। অন্যান্য মশ্‌লাগুলি ভেজে ভালোভাবে পিষিয়ে নিন;
- আদা রসুনের পেষ্টসহ মরিচের গুঁড়া একটা কড়াইতে ৫০ মিঃ লিঃ সরিষার তেলে কষিয়ে নিন;
- এবার কষানো মশ্‌লা চিনি মিশ্রিত পাল্পের সাথে যোগ করে জ্বাল দিতে থাকুন;
- পাল্প ঘন হয়ে আসলে বাকি মশ্‌লা কড়াইতে পাল্পের সাথে মিশিয়ে দিন;
- এরপর ভিনেগার/এসিটিক এসিড যোগ করুন এবং তাপ দিন;
- সামান্য গরম পানিতে সোডিয়াম বেন্‌জোয়েট মিশিয়ে পাল্পের সাথে যোগ করুন এবং
- মিশ্রণটি কাংখিত ঘনত্বে এলে জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ছিপি লাগিয়ে দিন এবং পরিস্কার ও শুকনা জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

কেচাপ বা সস্ তৈরী

ফল ও সবজির ঘন শাঁসালো রস বা পাল্পের সংগে বেশী মাত্রায় চিনি, ভিনেগার ও মশ্‌লা মিশিয়ে যে খাদ্য প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করা হয় সেই খাদ্যকে সস্ বা কেচাপ বলে। এই খাদ্যগুলি বেশ মুখরোচক। রুটি, পাউরুটি, ঘি বা তেলে ভাজা খাদ্যদ্রব্যের সংগে অল্প পরিমাণ সস্ বা কেচাপ মিশিয়ে খেতে বেশ ভালো লাগে। সাধারণতঃ পাকা টমেটো, পাকা তেঁতুল, কাঁচা আম ইত্যাদি থেকে সস্ বা কেচাপ তৈরী করা হয়।

টমেটো কেচাপ একটি জনপ্রিয় খাদ্য। ত্বক ও বীচিমুক্ত টমেটো পাল্পকে গাঢ় করে এটা তৈরী করা হয়। মশ্‌লা, লবণ, চিনি, আদা, পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি উপকরণ যোগ করা হয়, যাতে কমপক্ষে ১২% টমেটো সলিড্ এবং ২৫% টমেটো সমগ্র বা টোটাল সলিড্ থাকে।

ছক ১৭ টমেটো কেচাপ তৈরীর উপকরণ ও তার পরিমাণ			
উপকরণ	পরিমাণ	উপকরণ	পরিমাণ
টমেটো পাল্প	১.০ কেজি	গোল মরিচ্	০.২০ গ্রাম
চিনি	৬০ গ্রাম	এলাচ্	০.২০ গ্রাম
লবণ	১০ গ্রাম	জিরা	০.২০ গ্রাম
পিঁয়াজ	১৫ গ্রাম	জৈত্রী	০.৫০ গ্রাম
রসুন	৩০ গ্রাম	শুকনা মরিচের গুঁড়া	০.২২ গ্রাম
লবংগ	০.৫ গ্রাম	এসিটিক এসিড	৫.০০ মিঃ লিঃ
দারুচিনি	০.৫ গ্রাম	সোডিয়াম বেন্‌জোয়েট	০.৩৫ গ্রাম

কেচাপ তৈরীর পদ্ধতি

- মাধ্যম পাকা টমেটো কেচাপ তৈরীর জন্য বাছাই করে নিন;
- টমেটোগুলি পরিস্কার পানিতে ধুয়ে কেটে ছোট ছোট টুকরা করুন;
- টুক্‌রাগুলি একটা সস্‌পেনে নিয়ে কাঠের হাতা দিয়ে পিষে টমেটো পাল্প বের করুন। এরপর টুকরাগুলি হতে বেরিয়ে আসা রস পাত্রের মধ্যে রেখে ১৫-২০ মিনিট সিদ্ধ করুন। ত্বক ও বিচি যাতে আলাদা হতে পারে এজন্য কাঠের হাতা দিয়ে ভালোভাবে নাড়ুন। একটি সুক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালুনী দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে খোসা ও বীচি পাল্প থেকে আলাদা করুন। এই পাল্পই কেচাপ তৈরীতে ব্যবহার করতে হবে;
- পাল্প এবং উল্লেখিত পরিমাণ উপকরণগুলি মেপে নিন;
- পিঁয়াজ ও রসুন কুঁচি কুঁচি করে কেটে নিন । মরিচ, জিরা, গোলমরিচ, দারচিনি, ইত্যাদি গুঁড়া করে নিন এবং
- টমেটো পাল্প ও এক-তৃতীয়াংশ চিনি এবং অন্যান্য মশলা আলাদা একটি পুটলিতে

বেঁধে একত্রে কড়াই এর মধ্যে দিয়ে জ্বাল দিন।

মশ্‌লার পুটলি নিম্নরূপে প্রস্তুত করা হয়

- কুঁচি করে কাটা পিঁয়াজ, খোঁসা ছাড়ানো ও টুক্‌রাকৃত রসুন, মরিচের গুঁড়া আলাদাভাবে রাখা হয়;
- দারুচিনি, গোল মরিচ, এলাচ, জিরা, জৈত্রী, গুঁড়া করা হয়;
- উপরোক্ত সকল মশ্‌লা একত্রে একটা কাপড়ের টুক্‌রায় নিয়ে একটি থলির আকারে বেঁধে নিতে হয়;
- জ্বাল দেয়া টমেটো পাল্পের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ হলে মশ্‌লার থলেটি ভালোভাবে চেপে রস বের করে অবশিষ্ট চিনি ও লবন যোগ করুন;
- ২৪ ডিগ্রি ব্রিক্স পর্যন্ত রান্না করার পর এসিটিক এসিড যোগ করুন এবং সোডিয়াম বেন্‌জোয়েট সামান্য পানিতে দ্রবীভূত করে যোগ করে ২৫ ডিগ্রি পর্যন্ত রান্না করুন;
- তৈরীকৃত কেচাপ জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিয়ে ৫ মিনিট উল্টিয়ে রাখুন এবং
- বোতল পরিস্কার করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

পুটলি তৈরীর পরিবর্তে মশ্‌লাগুলি গুঁড়া করে একটি কড়াইয়ে সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে তাতে ভালোভাবে সিদ্ধ করে কাপড় দিয়ে ছেঁকে রসগুলি সসের সাথে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

গোলআলুর চিপ্‌স

উপকরণ ঃ মাঝারি ধরনের রোগ মুক্ত গোলআলু, লবণ, পটাশিয়াম মেটাবাইসালফেট (কেএমএস)
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ সসপেন, বটি অথবা ছুরি, পাইসার, ঝাঁঝরি ইত্যাদি।

তৈরীর পদ্ধতি

- আলুগুলি ভালো করে ধুয়ে নিন;
- হাতচালিত খোসা ছাড়ানোর যন্ত্র অথবা ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন এবং পানিতে ডুবিয়ে রাখুন
- খোসা ছাড়ানো আলু বটি অথবা স্লাইসার দিয়ে ১.৫ মি. মি. মাপে গোল করে কেটে ২% লবণ পানিতে (১ লিটারে ২০ গ্রাম লবণ) ডুবিয়ে দিন
- সব আলু কাটা শেষ হলে টুক্‌রাগুলি লবন পানি থেকে উঠিয়ে সাধারণ পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিন;
- এবার টুক্‌রাগুলি গরম পানিতে (৯০০ সেঃ তাপমাত্রায়) ৩-৪ মিনিট ব্লাঞ্চিং করুন;
- এরপর টুক্‌রাগুলি গরম পানি থেকে উঠিয়ে কে এম এস মিশ্রিত (০.৫ গ্রাম/লিটার) ঠান্ডা পানিতে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। কে এম এস এর পরিবর্তে ১% সাইট্রিক এসিড ব্যবহার করা যায়;
- এবার আলুর টুক্‌রাগুলি পানি থেকে ঝাঝরি চামচ দিয়ে উঠিয়ে এলুমিনিয়ামের অথবা স্টেইন্‌লেস স্টিলের চালুনীতে ঢেলে দিন;

- পানি ঝরে গেলে আলুর টুক্‌রাগুলি ফুটন্ত সয়াবিন তেলে ডুবিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিন;
- আলুর চিপ্‌সগুলি তেল মুক্ত করার জন্য পরিস্কার কাগজ/টিস্যু পেপারের উপর কিছুক্ষণ রেখে দিন;
- এবারে মরিচের গুঁড়া, বীট লবণ, ইত্যাদি মিশিয়ে পরিবেশন করুন এবং
- সংরক্ষণ করতে চাইলে পলিপ্রোপাইলিন প্যাকেট অথবা প্লাস্টিকের বৈয়ামে ভরে ভালোভাবে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে। বৈয়ামের ঢাক্‌নার চারিদিকে স্কচ্ টেপ্ আট্‌কিয়ে বন্ধ করা উত্তম।

গোলআলুর চিপ্‌স শুকিয়ে রাখতে হলে

- কে এম এস মিশ্রিত পানি থেকে আলুগুলি উঠিয়ে এবং পানি ঝরিয়ে নেটের উপর রেখে রৌদ্রে ভালোভাবে শুকাতে হবে যাতে মচ্‌মচে হয়;
- এরপর ঠান্ডা অবস্থায় টুক্‌রাগুলি পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগে অথবা প্লাস্টিকের বৈয়ামে ভালোভাবে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করুন; নিজেরা খাবার সময় অথবা বিক্রির সময় সয়াবিন তেলে ভেজে তাতে লবণ, মরিচ ও অন্যান্য মশলা ছিটিয়ে পরিবেশন/ বিক্রি করতে হবে;
- এভাবে ভালোমতো শুকানো ও প্যাকেট জাত গোলআলু এক বৎসর পর্যন্ত ঘরে রেখে খাওয়া যায়।

মডিউল -১৪

নিরাপদ খাদ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- নিরাপদ খাদ্য কি ? নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কেন। খাদ্যে ভেজাল মিশানো এবং খাদ্যে ব্যবহৃত সাধারণ ভেজাল সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
- বাড়ীতে ভেজাল নির্ধারণ করা যায় এমন সহজ পরীক্ষাসমূহ শিক্ষা করা
- ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আলোচনা করা এবং মানুষকে সচেতন করা।
- হাত ধোয়ার গুরুত্ব এবং ধাপগুলি অনুধাবন করা।

ভূমিকা

জীবন ধারনের জন্য আমরা খাদ্য গ্রহন করি। পুষ্টির জন্য প্রয়োজন খাদ্য। একজন মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ রোজগার করে। সেই অর্থে খাদ্য কেনা হয়, কিন্তু মানুষ সঠিক খাদ্য খাচ্ছে কিনা তা জানে না । বাংলাদেশে বেশীর ভাগ খাদ্য তৈরী বা প্রক্রিয়াজাত করা হয় অপরিচ্ছন্ন ও অনিরাপদ অবস্থায়। অপরিচ্ছন্ন ও অনিরাপদ খাদ্য গ্রহনের ফলে মানুষ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী নানা রকমের রোগে ভোগে। অপরিচ্ছন্ন ও অনিরাপদ খাদ্য বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়ে দূষনযুক্ত অথবা জীবানু বাহিত হয়। খাদ্য তৈরী থেকে গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে এই অবস্থা বিরাজ করে । খাদ্য প্রস্তুতকারী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ যেমন রেস্টুরেন্ট, ফাস্টফুড্ আউট্‌লেট যাই হোক না কেন প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে এই অপরিচ্ছন্ন, অনিরাপদ খাদ্য অবস্থার সাথে জড়িত থাকে। দূষিত খাদ্য ও পানি রোগ সংক্রমনের সাধারন উৎস। খাদ্যের মাধ্যমে প্রায়ই আমরা সুস্বাস্থ্যের পরিবর্তে রোগ বালাই ডেকে আনি। তাই নিরাপদ খাদ্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন।

নিরাপদ খাদ্য কি ? নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কেন ঃ

নিরাপদ খাদ্য হল এমন একটি খাদ্য ব্যবস্থা যার ফলে খাদ্য নিকৃষ্ট বস্তু থেকে মুক্ত থাকবে। পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং রোগ বালাই মুক্ত থাকবে। খাদ্যে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যাদি থাকবেনা এবং যা খেলে মানুষ অসুস্থ হবে না তাই-ই নিরাপদ খাদ্য। খাদ্য অনিরাপদ হয় একদিকে খাদ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর কেমিকেল বা বিষাক্ত অপ্রাকৃতিক বস্তু বা রং মিশানোর জন্য, অন্যদিকে পঁচা গলিত খাদ্য বা দীর্ঘ দিন মজুতকরণের খাদ্য যা পরবর্তীতে বিষাক্ততায় পর্যবসিত হয়। এই সমস্ত খাদ্য ভোক্তাকে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পরিবেশন করা হয়। খাদ্যের এই অনিরাপদ অবস্থা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভয়ানক ভাবে প্রভাবিত করছে যা অনেক দীর্ঘস্থায়ী রোগ যেমন ক্যান্সার, কিডনী নষ্ট, ডায়রিয়াজনিত অপুষ্টি, ইত্যাদির সৃষ্টি করছে। তাই নিরাপদ খাদ্য প্রয়োজন।

অনিরাপদ খাদ্যের প্রধান বিষয়গুলি এবং স্বাস্থ্যের উপর তাদের ফলাফল ঃ

(১) অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় খাদ্য নাড়াচাড়া ও পরিবেশন
(২) খাদ্যে ফরমালিন ও ডিডিডি ব্যবহার
(৩) খাদ্যে ক্ষতিকর ও বিষাক্ত রং মিশানো
(৪) খাদ্য অন্যান্য প্রনালীতে অনিরাপদকরণ,

যেমন- প্রতিদিন বাংলাদেশের অনেক মানুষ অনেক রকম অনিরাপদ খাদ্য খাচ্ছে। ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয় চালকে সাদা ও বড় করার জন্য। ইউরিয়া মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর যা ক্যান্সার এবং বিভিন্ন আল্‌সার তৈরী করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ফুলানো ভাতে প্রায় দ্বিগুন পরিমাণ ক্যাড্‌মিয়াম থাকে রান্না না করা চালের তুলনায়। এটা হতে পারে ইউরিয়া সার চালে ব্যবহারের জন্য। ক্যাড্‌মিয়ামের উপস্থিতি কিড্‌নী রোগের কারণ হতে পারে। বাংলাদেশে প্রায় ২০ মিলিয়ন লোক কিডনী রোগে অক্রান্ত।

ঘি একটি জনপ্রিয় খাদ্য। বাংলাদেশে যা খাঁটি দুধ থেকে তৈরী হয়। রেঁস্তোরাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গ্রামবাংলায় সকালের নাস্তায় গরম ভাতের সাথে ঘি খাওয়ার প্রথা আছে। ঘি অনেক ভাবে অনিরাপদ বা দূষিত হয়। দূষিত ভেজাল ঘি পচা দুধ থেকে তৈরী হয়। অনেক সময় দুধের পরিবর্তে পাম অয়েল, সয়াবিন, আলু মিশ্রন অপ্রাকৃতিক রং, গন্ধ ও অন্যান্য জিনিস মিশানো ঘি তৈরী করা হয়। ঘি এর ট্যানিন এর জন্য জনগণ পুষ্টিসম্মত খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়, যা পরিনামে শারীরিক অসুস্থতা সৃষ্টি করে। এ ছাড়া দৈ রেঁস্তোরাগুলিতে ডেজার্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় খারাপ দুধ থেকে দৈ তৈরী হয়।

নিরাপদ খাদ্যের উদ্দেশ্য হল খাদ্যবাহিত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া।

বাংলাদেশে খাদ্য সংক্রমিত রোগ ও অনিরাপদ খাদ্য পরিস্থিতি জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর সমস্যা। অনিরাপদ বা সংক্রমিত খাদ্যের কারনে অনেক গুরুতর এবং জীবনে দীর্ঘস্থায়ী রোগ হতে পারে। খাদ্যবাহিত ও পানিবাহিত ডায়রিয়া রোগে বহু লোক বছরে মারা যায়, যার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে শিশু। অনিরাপদ খাদ্যের মধ্যে কেমিক্যাল থাকার কারনে ক্যান্সার, কিড্‌নী অকেজো হওয়া, বা জন্মগত সমস্যা হতে পারে। বাংলাদেশে খাদ্য সংক্রামন ও সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণ খাদ্য নিরাপত্তায় ও ভোক্তার স্বাস্থ্যে প্রধান ভূমিকা রাখে। কম সচেতনতা,খাদ্য আইনের দূর্বল প্রয়োগ দেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির জন্য দায়ী। আর এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরকার খাদ্য তৈরী থেকে শুরু করে খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা, সচেতনতা সৃষ্টি, সুপানীয়ের ব্যবস্থা, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা ও উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণ। এতে খাদ্যবাহিত রোগ কমবে।

ভেজাল নির্ধারণ করা

খাদ্যে ভেজাল মিশানো হলো এমন একটি কাজ যেখানে ইচ্ছাকৃত ভাবে খাবারে নিম্ন মানের বস্তু মিশানো হয় অথবা কিছু মূল্যবান খাদ্য উপাদান অপসারণ করে খাদ্যের গুণগত মান কমিয়ে বিক্রি করা হয়।

খাদ্যে ভেজাল মিশানো বলতে শুধুমাত্র খাদ্যের প্রকৃতি, উপাদানে এবং গুণমানে কু-প্রভাব সৃষ্টি করে এমন উদ্দেশ্যমূলক ভেজাল বস্তু যোগ করা, খাদ্য পরিবর্তন করাকেই ধরা হয় না বরং উৎপাদন, ফসল তোলা, মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, স্থানান্তরণ এবং বিতরনের সময়ের দূষনকেও ধরা হয়।

ভেজাল কি ?

যে পদার্থ খাদ্যকে অনিরাপদ, নিকৃষ্টমানের বস্তুর বাহক করে তুলতে ব্যবহার করা হয় তাকে ভেজাল বলা যায়। ভেজাল মিশানো খাদ্য বিপজ্জনক। কারণ এটা খাদ্যকে বিষাক্ত করে এবং স্বাস্থ্যের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভেজাল খাদ্য পরিমানে বৃদ্ধি ও তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থেকেও বঞ্চিত করতে পারে। সাধারণতঃ ভেজাল মিশানো হয়, এমন খাদ্যগুলি হল দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য, দানা-শস্য, আটা, ডাল, বেসন, ভোজ্য তেল, মশ্‌লা(গোটা এবং গুঁড়া), কফি, চা, মিষ্টি খাবার (কনফেকশনারী), বেকিং পাউডার, অন্য পানীয়, ভিনিগার এবং কারী পাউডার।

ছক ১৮ . খাদ্যে ভেজাল মেশানোর পদার্থ সমূহ	
ধরণ	মিশ্রিত পদার্থ
অসৎ উদ্দেশ্যে মিশানো ভেজাল	বালি, মার্বেল কুচি, পাথর, মাটি, অন্যান্য ময়লা, কাঁচের মত পদার্থ, চকের গুড়া, পানি, খনিজ তেল, ফর্মালিন, ক্যাল্‌সিয়াম কার্বাইড, এবং ক্ষতিকারক রং
ঘটানোচক্রে মিশানো ভেজাল	রোগ ও পোকা দমনকারী ঔষুধের অবশেষ, ইঁদুরের বর্জ্য,লার্ভা
ধাতব দূষক	পানির মধ্যে থাকা সীসা, দস্তার খেলনা, রং, রাসায়নিক কারখানার বর্জ্য পানি, কৌটার টিন

ছক ১৯. খাদ্যে প্রচলিত ভেজাল নির্ণয় করার পদ্ধতি		
খাদ্য	ভেজালের উপকরণ	পরীক্ষা পদ্ধতি
সুজি	লৌহ চূর্ণ ওজন বাড়ানোর জন্য	একটি চুম্বক সুজির মধ্যে ঘুরালে লৌহ চুম্বকের গায়ে উঠে আসবে।
সাবুদানা	বালি এবং ট্যাল্‌কম পাউডার	সামান্য জলে সাবুদানা গরম করতে হবে, গন্ধ সাবুদানা ফুলে উঠবে এবং পুড়িয়ে ফেললে এর কোনো ছাই থাকবে না।
ডাল		৫ গ্রাম ডাল ৫ গ্রাম পানির সাথে মিশিয়ে ভালো করে নাড়াতে / ঝাঁকাতে হবে। তারপর, কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করতে হবে। মিশানোর রং গোলাপী হলে বুঝতে হবে ডালে লেড ক্রোমেট আছে।
গুড়	১. মেটানিল ইয়েলো ২. চকের গুঁড়া	১. গুড়ের দ্রবনে কয়েক ফোটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করলে দ্রবনের রঙ ম্যাজেন্টা (লাল-নীল) হবে। ২. একটি টেস্ট টিউবে অল্প পরিমানে দ্রবীভূত করতে হবে, চকের গুঁড়া থাকলে টেস্ট টিউবের তলায় থিতিয়ে পড়বে।
ঘি বা মাখন	বনস্পতি (ডাল্‌ডা জাতীয়)	১ চা চামচ চিনি, ১০ মি.লি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এ দ্রবীভূত করতে হবে।তারপর ১০মি.লি ঘিগলিয়েতার মধ্যে যোগ করে ১ মিনিট ভালো ভাবে নাড়াতে হবে। মিশ্রণটি ১০ মিনিট ঝাঁকাতে হবে। মিশ্রণটিকে ১০ মিনিট রেখে দিলে জলীয় অংশ যদি লাল রং ধারণ করে তাহলে বুঝতে হবে বনস্পতি আছে।
দুধ	১. পানি ২. ফর্মালিন	১. ল্যাকটোমিটারের সাহায্যে দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপতে হবে। সাধারণতঃ দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব = ১.১০৩০ থেকে ১.০৩৪০ ২. একটি টেস্ট টিউবে ১০ মি.লি দুধ নিয়ে তাতে ৫ মিলি গাঢ় সালফিউরিক এসিড টেস্ট টিউবের ভিতরের গা বেয়ে ধীরে ধীরে এমনভাবে ঢালতে হবে যেন টেস্টটিউব না নড়ে। যদি দুটি তরলের সংযোগ স্থলে নীল বা বেগুণী রংয়ের বলয় সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝতে হবে দুধে ফর্মালিন মিশানো হয়েছে।

সবুজ কাঁচামরিচ এবং সবুজ শাক-সব্জি	ম্যালাকাইট গ্রীন	তরল প্যারাফিনে এক টুক্রা তুলা ভিজিয়ে সবুজ সব্জির উপর ঘষ্লে যদি তুলার রং সবুজ হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে সবুজ শাক-সব্জিতে ম্যালাকাইট গ্রীন মিশানো হয়েছে
চা-পাতা	শুক্না চা-পাতার গুড়া ও কৃত্রিম রং	একটি সাদা এবং ভিজা ব্লটিং পেপারের উপর চা-পাতার গুড়া ছড়িয়ে দিতে হবে। যদি ব্লটিং পেপারে হলুদ এবং লাল রংয়ের দাগ দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে চা-পাতায় কৃত্রিম রং মিশানো হয়েছে।
এলাচি	তেল বের করা ও ত্বকের উপর ট্যাল্কম পাউডার দেয়া	এলাচের ত্বকের উপর আঙ্গুল ঘষলে ট্যালকম আংগুলে লেগে থাকবে। ঘ্রান নিলে যদি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধ না পাওয়া যায়, তা হলে বুঝতে হবে অপরিহার্য তৈলাক্ত পদার্থ সরিয়ে নেয়া হয়েছে।
দারুচিনি	অন্য গাছের ডাল	দারুচিনি গাছের ছাল থেকে দারুচিনি পাওয়া যায়। অনেক সময় অন্য গাছের ডাল মিশনো হয় যা দারুচিনি ছাল থেকে শক্ত এবং দারুচিনির মত বৈশিষ্টপূর্ণ সুগন্ধ থাকে না।
লবঙ্গ	তেল বের করা	তেল বের করে নেয়া লবঙ্গে বৈশিষ্টপূর্ণ সুগন্ধ থাকে না এবং লবঙ্গ শুক্না দেখা যায়।
গোলমরিচ	পেঁপের বীজ	লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পেঁপের বীজগুলি শুকনো, ডিম্বাকৃতি এবং ধূসর বাদামী রংয়ের।
কালোজিরা	ঘাসের দানা ও কয়লা গুঁড়া মিশানো	কালোজিরা হাতের তালুতে নিয়ে ঘসা দিলে যদি হাতের তালু কালো হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে ঘাসের দানা ও কয়লা গুড়া মিশানো হয়েছে।
মরিচের গুড়া	লাল রং ও কাঠের গুঁড়া মিশানো	একটি পাত্রে পানি নিয়ে তার মধ্যে মরিচের গুড়া ছড়িয়ে দিলে কাঠের গুড়া ভেসে থাকবে এবং রং মিশানো থাকলে সেই রং ধারণ করবে।
হলুদ	১. মেটানিল ইয়েলো ২. স্টার্চ	১. যখন হলুদের দ্রবনে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশানো হয় তখন এটা ম্যাজেন্টা রংয়ে পরিনত হবে যদি হলুদের গুড়াতে মেটানিল ইয়েলো মিশানো থাকে। ২. হলুদের দ্রবনে আয়োডিন মিশানো হলে এটি বেগুনী রং ধারন করবে যদি তাতে স্টার্চ মিশানো থাকে।
সাধারন লবণ	সাদা পাউডার	এক গ্লাস পানিতে এক চা-চামচ লবণ মিশিয়ে নাড়াচাড়া করলে যদি দ্রবনের রং সাদা হয় তবে বুঝতে হবে লবনে সাদা পাউডার মিশানো আছে। অন্যান্য অদ্রবনীয় পদার্থ থিতিয়ে পড়বে।
অয়োডিনযুক্ত লবন	সাধারন লবন	একটি আলুর টুক্রাতে সামান্য লবন ছিটিয়ে ১ মিনিট পর দুই ফোঁটা লেবুর রস দিলে যদি এটি নীল বর্ণ ধারণ করে তবে বুঝতে হবে লবনে আয়োডিন যুক্ত করা আছে । নীল রং না হলে বুঝতে হবে লবনে আয়োডিন নাই। এটি সাধারন লবন।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

ভালো স্বাস্থ্যের জন্য একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি বা বাসস্থান প্রয়োজন। ধূলা-বালি ও জীবানু আমাদের অসুস্থ করে তোলে। রোগ, অসুস্থতা এবং ডায়রিয়ার সময়ে আমরা শক্তি এবং পুষ্টি উপাদান হারাই। ছোট শিশুদের অর্ধেকেরও বেশীর অসুস্থতা ও মৃত্যুর কারণ জীবানু যা খাদ্য, পানি এবং অপরিস্কার হাতের মাধ্যমে শিশুদের মুখ ও চোখের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। বেশীর ভাগ জীবানু মানুষের ও পশুর বিষ্ঠা/মল থেকে আসে। পরিচ্ছন্ন অভ্যাস দ্বারা অনেক অসুস্থতা, বিশেষত ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা যায়।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

পরিচ্ছন্নতা নিজের ও পরিবারকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

পরিস্কার পানি ও সাবান অথবা ছাই দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।বিশেষত --

- পায়খানায় যাওয়া, শিশুর পায়খানা বা কাপড় পরিস্কার করার পর।
- মল বা বিষ্ঠা দিয়ে মাখানো নোংরা বিছানার চাদর বা দূষিত মেঝে পরিস্কার করার পর।
- প্রাণী পরিচর্যার পর। খাবার তৈরী এবং খাওয়ার আগে ও পরে।
  শিশু অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে খাওয়ানোর আগে।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক

- প্রতিদিন সাবান ও পানি দিয়ে মুখ-মন্ডল ধোয়া চোখের সংক্রমণ রোধ করে।
- শিশু ও তাদের অভিভাবকদের প্রতিদিন গোসল করতে হবে।
- শৌচাগার ব্যবহার করা এবং শিশুদের শৌচাগার ব্যবহার করা শিখাতে হবে।
- শিশুরা সহজেই কৃমি দ্বারা সংক্রামিত হয়। মানুষ ও অন্যান্য পশুর মল ও প্রস্রাবে, মাটির উপরের পানি ও মাটিতে এবং অল্প রান্না করা মাংসে কৃমি ও তার ডিম পাওয়া যায়। শৌচাগার বা পায়খানার নিকটে শিশুদের খেলা করতে দেয়া উচিৎ নয়। পায়ের চামড়া ভেদ করে শরীরে কৃমির প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য শৌচাগার বা তার আশেপাশে যাওয়ার সময়ে জুতা বা স্যান্ডেল ব্যবহার করা উচিৎ।
- নখ ছোট ও পরিস্কার রাখতে হবে।
- খাদ্য ও পানির কাছে কাশি বা থুথু ফেলা উচিৎ নয়। কাশা-কাশি করার সময় মুখে হাত দিয়ে বা রুমাল বা পরিস্কার কাপড় ব্যবহার করা উচিৎ।

শৌচাগার, খাওয়ানোর ও রান্নার জায়গা এই তিনটি জায়গায় সবসময় সাবান ও পানি রাখতে হবে

কিভাবে হাত ধুতে হবে জেনে নিন

কোন মানুষের হাত ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে সাবান দিয়ে মেখে পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিৎ। হাত ধোয়ার ধাপ গুলি জেনে নিন।

হাত ধোয়ার ৬ টি ধাপ নীচে দেয়া হল ঃ

১. হাতের তালু ঘষুন	২. আংগুলের ডগায়
৩. হাতের পিছন দিক	৪. বুড়ো আংগুল এবং
৫. আংগুলের ফাঁকে	৬. কব্জি ও নখ

পানির অপচয় রোধে টিপি টেপ ব্যবহার করা দরকার

টিপি টেপ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল জন-সাধারণকে পানিতে হাত ধোয়ার জন্য উৎসাহিত করা এবং পানির অপচয় রোধ করা। এটি রান্না ঘর, শিশুর খাবার পরিবেশনের স্থান ও পায়খানায় ঝুলিয়ে রাখুন।

উপকরণ ঃ খালি বোতল, ম্যাচ, পেরেক, কাঠি

- পরিস্কার পানির বোতলের নিচের দিক ম্যাচের কাঠি বা গরম পেরেক দিয়ে, ছিদ্র করুন
- বোতলটি দাঁড়ানো অবস্থায় রাখুন অথবা দড়ি দিয়ে বোতলটিকে কোথাও ঝুলান
- বোতলটি পানি দিয়ে ভরুন এবং ঢাক্না লাগিয়ে দেন
- পানির বোতলের কাছে সাবান রাখুন
- হাত ধোয়ার সময় বোতলের ঢাক্না খুলে নিন ও হাত ধোয়া শেষ হলে ঢাক্না বন্ধ করুন

স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপায় হল পারিবারিক পরিচ্ছন্নতা

- সব সময় একটি গর্তে আবর্জনা ফেলে চাপা দিতে হবে
- একটি শোষক গর্ত তৈরী করে বা জমির দিকে একটি সরু নালা খুঁড়ে পারিবারিক বর্জ্য পানি নিরাপদে বের করে দেয়া যায়।
- নিরাপদ পানি, যেমন শোধন করা নলের পানি, সবুজ নল কূপের (আর্সেনিক মুক্ত) পানি বা সুরক্ষিত উৎস থেকে পাওয়া পানি যেমন, সুরক্ষিত কূয়া (যেখানে গোসল করা, কাপড় কাচা হয় না, এবং পানি দূষিত নয়) ব্যবহার করতে হবে।
- ঘর-বাড়ী এবং কাছাকাছি জায়গা পরিস্কার ও বিষ্ঠামুক্ত, বর্জ্য ও ময়লাপানি মুক্ত রাখুন। এই পদক্ষেপ রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।
- যদি পায়খানা বা শৌচাগার না থাকে তবে উচিৎ বাড়ী থেকে, পথ থেকে, পানির উৎস থেকে এবং বাড়ীর শিশুরা যেখানে খেলাধুলা করে সেই স্থান থেকে দুরে মল ত্যাগ্ করা । মল বা বিষ্ঠা যতদ্রুত সম্ভব মাটি চাপা দিতে হবে।
- খাবার ও পানি নিরাপদ রাখতে হবে।
- পানি পরিস্কার রাখতে হবে এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে
- রান্নার উপকরণ ধোয়া ও খাবার জন্য নল-কূপ থেকে নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে হবে।
- পানি সংগ্রহের পর, মওজুদ্ ও সংরক্ষণে ঢাক্না ব্যবহার করতে হবে।
- পানি সংরক্ষণে এবং পানি পান করার পূর্বে পানি ফুটিয়ে অথবা ফিট্‌কিরি দিয়ে বা পানি শোধনকারী ট্যাবলেট ব্যবহার করে শোধিত করে নিতে হবে।
- অনিরাপদ উৎস যেমন- পুকুর, নদী, খোলা ট্যাংক, এবং কূয়া থেকে পাওয়া পানি দশ মিনিট চুলায় ফুটিয়ে নিয়ে নিরাপদ করা যায়।
- পশু পাখিদের পানির উৎস ও ঘরবাড়ি থেকে দূরে রাখতে হবে।
- পানি সংগ্রহ ও মওজুদ করতে ব্যবহার্য পাত্রগুলি যেমন বাল্‌তি, কলস, জগ, মাটির মট্‌কা, পানি তোলার দড়ি ইত্যাদি পরিস্কার রাখতে হবে এবং পরিস্কার স্থানে, সম্ভব হলে কিছুটা উঁচু জায়গায় রাখতে হবে ।

অপরিস্কার হাতে পরিস্কার পানি স্পর্শ করা উচিৎ নয়। পানি তুলবার জন্য সবসময় একটি পরিস্কার মগ, কাপ, বাটি বা অন্য কোন পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

নিরাপদ স্থানে খাদ্য মওজুদ্ করণ

- খাদ্যকে ধূলা বা পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করার জন্য সবসময় ঢেকে রাখতে হবে, এজন্য ঢাক্না বা পরিস্কার কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে।
- শুক্না খাবার যেমন আটা, ডাল, শুস্ক ঠান্ডা জায়গায় রাখলে কীট্-পতঙ্গ, ইঁদুর ও ছুঁচো এবং অন্যান্য অপকারী পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা পাবে।

পোকা দমনকারী ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক নিরাপদে রেখে ব্যবহার করণ

- পোকা-মাকড় দমন কারী ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
- রাসায়নিক ও ঔষধ ব্যবহার হয়ে যাওয়ার পর ঐ খালি পাত্রে কখনো খাবার রাখা উচিৎ নয়।
- পোকা-মাকড় দমনকারী ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক ব্যবহারের পর হাত ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে ।

পুষ্টি উন্নয়নে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ৯ টি অংগ নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান এবং পুষ্টির উন্নয়ন,
২. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা,
৩. বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ,
৪. পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা,
৫. মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ,
৬. টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন,
৭. আঞ্চলিক রোগের চিকিৎসা এবং নিবারণ,
৮.সাধারণ ও আঘাতজনিত ক্ষতের চিকিৎসা এবং
৯. অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

মডিউল -১৫

পুষ্টি উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য

- মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য ও পুষ্টির অভাব পূরণে নারী সমাজের অবদান।

ভূমিকা

জাতি-সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনে এফএও'র সদস্যভূক্ত দেশগুলোতে ১৬ অক্টোবর বিশ্বখাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। জাতি-সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশসহ ১৫০টিরও বেশী দেশে এ দিবস পালিত হচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টিসহ শিশুর খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলাই এ দিবসের মূল উদ্দেশ্য। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ দিবসে র‍্যালী, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা ও কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে খাদ্য উৎপাদন, ঘাটতি, সংগ্রহ, বিতরণ, পুষ্টি পরিস্থিতি, সমস্যা ও সমাধান এবং কারিগরি বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে জনগণ, কৃষিবিদ, পুষ্টিবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

মানুষের প্রথম ও প্রধান মৌলিক অধিকার হচ্ছে অন্ন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা যেহেতু পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে, সেহেতু মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য ও পুষ্টির অভাব পূরণে নারী সমাজের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অপুষ্টি একটি পারিবারিক, সামাজিক ও সর্বোপরি জাতীয় সমস্যা। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী নিম্নমানের খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের ফলে নানা প্রকার অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। দিন দিন বিশেষ করে বন্যা-উত্তর অবস্থা আরও প্রকট আকার ধারণ করছে। পুষ্টিহীনতার জন্যে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ঠিকমত হয় না। এর জন্য একদিকে আমাদের জনগণের কর্মদক্ষতা ও শ্রম উৎপাদন হ্রাস, আয় কম, অন্যদিকে মেধাহীন হচ্ছে। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়নে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

কৃষিনির্ভর জনবহুল বাংলাদেশের কৃষির উৎস হচ্ছে- ফসল, পশুপাখি ও মৎস্য সম্পদ। এসব উৎস আমাদের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিচ্ছে। কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীই খাদ্য ও পুষ্টির দিক দিয়ে নিরাপদ নয়। উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও উৎপাদিত পণ্য শেষ পর্যন্ত তাদের ঘরে থাকে না। আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, দুর্ভিক্ষ, পুষ্টিজ্ঞানের অভাব, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যর্থতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের খাদ্য শেষ পর্যন্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে পুষ্টিহীনতার ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই মহিলা বা নারী। এ অর্ধেক জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কৃষি কার্যক্রমের ওপরই দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল।

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের মহিলারা পারিবারিক কাজের সাথে ফসল, শাক-সব্জি ও ফল-মূলের চাষ, পশুপাখি পালন, খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবেশ উন্নয়নে কাঠ ও অর্থকরী গাছের চাষ, রান্না ইত্যাদি কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের অধিক খাদ্য উৎপাদন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অপুষ্টি দূরীকরণে অমূল্য অবদান রাখছে। মোটকথা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন থেকে খাদ্যগ্রহণ পর্যন্ত যেসব ধাপ রয়েছে তার প্রায় সবগুলিই মহিলারা করে থাকে।

খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের সাথে মহিলাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানবজীবন ভ্রূণ হিসেবে একটি কোষ দ্বারা যখন শুরু হয়, তখন থেকে তার খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আর এ খাদ্যের যোগান দেয় গর্ভবতী মহিলা। এভাবে প্রায় ২৮০ দিনের মতো মাতৃগর্ভে ভ্রূণের

রক্ষা, বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য খাদ্যের নিরাপত্তা দেয় গর্ভবতী মহিলা। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বেঁচে থাকা, দ্রুত বৃদ্ধি, গঠন ও অপুষ্টি থেকে রক্ষার জন্য প্রসূতি মহিলার বুকের দুধ দিয়ে বাড়ন্ত শিশুর খাদ্যের যোগান দেয়। পরবর্তীতে শিশুর দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার দেয়া হয়। বাড়ন্ত শিশুদের পরিপূরক খাবারও দেয়ার দায়িত্ব মহিলাদের। এভাবে শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত খাদ্যের মূল দায়িত্ব মা অর্থাৎ মহিলার উপরই ন্যস্ত থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বৈবাহিক জীবন শুরু হলে খাদ্যের দায়িত্ব এসে পড়ে বৌ- এর ওপর, সেও একজন মহিলা। বৃদ্ধ বয়সে মেয়ে বা ছেলের বউয়ের ওপর পরিবারের বয়ো-জ্যেষ্ঠদের খাদ্য যোগানের দায়িত্ব দেয়া হয়। কাজেই মানবজীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাদ্যের যোগান দেয় মহিলা।

পারিবারিক খাদ্য পরিকল্পনা, তৈরী, পরিবেশনা ও গ্রহণের সিদ্ধান্ত সাধারণত মহিলারাই নিয়ে থাকেন। মহিলাদের খাদ্য পরিকল্পনা, তৈরী ও গ্রহণের সময় সুষম খাদ্য অর্থাৎ পুষ্টি উপাদানের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। যে খাদ্যে সকল পুষ্টি উপাদান দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণে থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পুষ্টি চাহিদার নিশ্চয়তার জন্য সঠিক পরিমাণে তিন প্রকার খাদ্য যেমন- (ক) শক্তিদায়ক খাদ্য, (খ) শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পুরক খাদ্য এবং (গ) রোগ প্রতিরোধক খাদ্য অন্তর্ভূক্ত করা হলেই খাবার সুষম হবে।

শক্তিদায়ক খাদ্য মানবদেহকে খাদ্যশক্তি (ক্যালরি) সরবরাহ করে। দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখা, দেহাভ্যন্তরের ক্রিয়া কান্ড অব্যাহত রাখা ও পরিশ্রম করার জন্য ক্যালরির প্রয়োজন। কার্বোহাইড্রেট (চাল, আটা, আলু, মিষ্টি আলু) এবং ফ্যাট জাতীয় খাদ্যই (সরিষার তৈল, সয়াবিন তৈল, ঘি, মাখন) আমাদের শরীরে ক্যালরি যোগায়। ক্যালরির অভাবে ম্যারাসমাস নামক মারাত্মক অপুষ্টিজনিত রোগের সৃষ্টি হয়। দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী ক্যালরিবহুল খাদ্য যেমন-চাল, আটা, আলু, মিষ্টি আলু, গুড়, তৈল ইত্যাদি গ্রহণ করলে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ক্যালরিবহুল খাদ্যগুলি ক্ষেত থেকে বাড়ীতে আনার পর মাড়াই ঝাড়াই, শুকানো, সিদ্ধ, গুদামজাত করা, চাল করা, গম ভাঙানো, রান্না, (ভাত, রুটি) ইত্যাদি কাজ মহিলারাই করে থাকে। কাজেই শক্তিদায়ক খাদ্য উৎপাদন থেকে গ্রহণ করা পর্যন্ত মহিলাদের অবদান অনেক বেশী।

শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাদ্য নতুন দেহকোষ গঠনের মাধ্যমে বাড়ন্ত শিশুদের শরীর বৃদ্ধি ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভেঙ্গে যাওয়া কোষগুলির ক্ষয়পূরণ করে থাকে। পুষ্টি উপাদানগুলির মধ্যে প্রোটিন (মাছ,মাংস, ডিম, দুধ, ডাল) মূলতঃ শরীরের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে। প্রোটিনের অভাবে মানবদেহ বামন আকৃতি, অপুষ্টি, ও দূর্বল হয়। মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশও ঠিকমত হয় না। প্রোটিনের গুরুতর ঘাটতি হলে কোয়াশিওরকর নামক প্রোটিন ক্যালরির অভাবজনিত এক প্রকার অপুষ্টি পরিলক্ষিত হয়।

প্রোটিন উৎপাদনে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ মহিলারা প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর উঠানে হাঁস-মুরগী, কবুতর পালনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এদের খাদ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও সেবা যত্ন মহিলারাই করে। এদের মাংস ও ডিম আমাদের প্রোটিন সরবরাহ করে। গবাদি পশুর খাদ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও তাদের পরিচর্যার মাধ্যমে গবাদি পশু পালন ও দুধ উৎপাদনে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মহিলারা জাল বোনা ও মেরামত করা, মাছের খাদ্য তৈরী ও সরবরাহ, মাছে বরফ দেয়া, লোনা দেয়া, শুঁটকি করার মাধ্যমে মাছ ও মাছ জাতীয় খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ অবদান রাখছে। এক কথায় বসত-বাড়ীতে পশু(গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া), পাখি (হাঁস, মুরগী, কোয়েল, কবুতর) পালন ও মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রোটিনের অভাব দূর, বেকারদের কর্ম-সংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা আনয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভিটামিন ও খনিজ লবণ জাতীয় খাদ্যকে রোগ প্রতিরোধক খাদ্য বলা হয়। এ খাদ্যগুলি বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে দেহকে রোগমুক্ত রাখে। এর অভাব হলে রাতকানা, অন্ধত্ব, রক্তস্বল্পতা, গলগন্ড, স্কার্ভি, বেরিবেরি, রিকেট্স ইত্যাদি নানা ধরনের মারাত্মক অপুষ্টিজনিত রোগ পরিলক্ষিত হয়। শাক-সবজি ও ফল-মূলকে মূলতঃ রোগ

প্রতিরোধকারী খাদ্য বলা হয়। মহিলারা বাড়ীর আঙ্গিনা সংলগ্ন জমিতে শাক-সবজি ও ফল-মূলের বীজ/চারা লাগানো, পানি দেয়া, আগাছা বাছাই, সার প্রয়োগ, পোকা-মাকড় দমন ও পরিচর্যার মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ অধিক শাক-সব্জি ও ফল-মূল উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে গৌণ পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগ দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলারা বিশেষ অবদান রাখছে। মহিলারা শুধু খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনই করে না- খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে অমূল্য অবদান রাখছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খাদ্য গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ মহিলাদের মাঝে হস্তান্তর করলে খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে সহায়ক হবে। খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে মহিলারা যথেষ্ট অবদান রাখলেও, বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মহিলা আজ অপুষ্টির শিকার। এ বিপুল সংখ্যক মহিলার পুষ্টি উন্নয়ন ছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। মহিলাদের উন্নয়নের জন্য বাল্য বিবাহ ও বাল্য গর্ভধারণ বন্ধ, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ রোধ, গর্ভকালীন পরিচর্যা, নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার, কন্যা ও পুত্রের বৈষম্য দূর, পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ, সুষম খাদ্য বন্টন, খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সমাজে ও পরিবারের মহিলাদের অবদান ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে বেতার, টেলিভিশন, পোস্টার, লিফলেট, সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মহিলা মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন। এ দু'সম্পদ ও বিজ্ঞানভিত্তিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সুষম খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন, জনগণের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ ও পুষ্টি উন্নয়ন হবে। ভবিষ্যতে দেশে সুস্থ, সবল, কর্মঠ ও নিরোগ জনশক্তি গড়ে উঠবে। তারা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসহ সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তখনই দেশ হয়ে উঠবে সম্পদশালী ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। জনগণের মুখে ফুটবে উজ্জ্বল হাসি।

মডিউল - ১৬

বাংলাদেশের খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
দানাদার শস্য জাতীয় খাদ্য	৬৬
ডাল জাতীয় খাদ্য	৬৬
সব্জী জাতীয় খাদ্য	৬৮
শাক্ জাতীয় খাদ্য	৭০
ফল জাতীয় খাদ্য	৭২
মাছ জাতীয় খাদ্য	৭৬
মাংস জাতীয় খাদ্য	৭৮
ডিম জাতীয় খাদ্য	৭৮
দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য	৮০
চর্বি ও তৈল জাতীয় খাদ্য	৮০
বাদাম, বীজ জাতীয় খাদ্য	৮২
মশ্‌লা জাতীয় খাদ্য	৮২
পানীয় জাতীয় খাদ্য	৮৪
মিশ্রিত(পাঁচ মিশালী) জাতীয় খাদ্য	৮৪

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

দানাদার শস্য জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১।	চাল সিদ্ধ ঢেকি ছাঁটা	৩৪৮	১২.৬	৭.৬	২.৩	৭২.৪	৩.৮
২।	ভাত সিদ্ধ ঢেকি ছাঁটা	১১২	৭২.০	২.৪	০.৭	২৩.২	১.২
৩।	চাল সিদ্ধ কলে ছাঁটা	৩৪৯	১০.৯	৬.৯	০.৩	৭৭.৯	৩.৪
৪।	চাল সিদ্ধ কলে ছাঁটা	৩৪৯	১০.৮	৭.০৮	০.৩	৭৭.৯	৩.৪
৫।	চিড়া	৩৫৬	৯.৯	৬.৫	১.১	৭৯.২	১.৩
৬।	খৈ	৩৮০	৩.৯	৭.১	০.১	৮৭.০	১.৪
৭।	মুড়ি	৩৬১	৭.৩	৬.৭	০.১	৮২.৭	১.৪
৮।	সুজি, গম	৩৪৬	১২.৮	১০.৯	১.৪	৭০.৬	৩.৯
৯।	আটা লাল	৩৩৪	১২.৩	১১.৩	২.১	৬২.২	১০.৭
১০।	আটা সাদা	৩৪৭	১২.২	১০.৬	১.৬	৭০.৩	৪.৪
১১।	ময়দা	৩৪৬	১২.৮	৯.৮	১.০	৭৩.১	২.৭

ডাল জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১২।	ছোলার ডাল ভাংগা	৩৭৫	১০.৫	২০.২	৬.০	৫৯.২	১.২
১৩।	মাসকালাই ডাল ভাংগা	৩৫০	১০.৫	২২.৬	১.২	৬১.৮	০.৯
১৪।	মুগ ডাল ভাংগা	৩৫১	৯.৮	২৩.৭	১.২	৬০.৯	০.৭
১৫।	খেসারী ডাল ভাংগা	৩৫২	৯.৪	২৮.৪	০.৯	৫৬.৫	২.২
১৬।	মুসুরী ডাল	৩১৭	১২.২	২৭.৭	০.৮	৪৩.২	১৩.২
১৭।	মটর ডাল	৩২৭	১১.৭	২২.১	২.১	৪৮.৩	১৩.০

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
১০	২.৮	১.৯০	০	০.৬৮	০.২৭	০.০৭	০
৬	১.০	০.৫৮	০	০.২২	০.০৪	০.০২	০
২	০.৭	১.৩৪	০	০.০৮	০.১১	০.০৬	০
২	০.৭	১.৩৪	০	০.০৮	০.০৯	০.০৬	০
২৫	৬.৮	১.৩৬	০	-	০.২১	০.০৫	০
১০	০.৭	০.৮৭	০	০.১০	০.২১	০.২৭	০
৯	০.৭	০.৮৪	০	০.১০	০.২১	০.১২	০
১৭	১.১	২.১৮	০	০.১	০.১৮	০.০৫	০
৫২	৪.৯	৩.০২	০	০.৭২	০.৪৯	০.১৭	০
১৩	৩.৮	১.৫৫	০	০.৪৩	০.১৩	০.০৫	০
১৩	২.৭	১.৫৫	০	০.০৬	০.১২	০.০৭	০

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
৫৬	৮.৮	৩.৩৪	৩	২.৮৮	০.৪৮	০.২৭	সামান্য
৫৩	৩.৩	২.৪৫	৫	১.৯	০.৪২	০.১৮	সামান্য
৬৯	৭.২	২.৭৩	৩	১.৯	০.৩৬	০.১৪	সামান্য
৬১	৫.৩	৩.৩৮	৫	০.৫	০.৩৭	০.২১	সামান্য
২৩	৫.১	৩.৮৯	৩	০.৩৭	০.৭৭	০.১৩	০
৭৫	৪.৮	৩.৪৯	৩	১.০৪	০.৪৭	০.১৩	সামান্য

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

সব্জী জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১৮।	ডাটা	২১	৯২.৩	০.৯	০.১	৩.৭	১.২
১৯।	সীম	৫৪	৮৫.০	৩.৯	০.১	৮.৩	২.০
২০।	বেগুন কালো লম্বা	২৪	৯১.৪	১.৯	০.১	২.০	৪.১
২১।	বাঁধা কপি	২৪	৯২.৭	১.৫	০.৩	২.৬	২.৫
২২।	গাজর	৩৪	৮৯.৭	০.৯	০.৩	৬.০	২.৬
২৩।	ফুলকপি	২৭	৯১.৮	২.৬	০.৩	২.৫	২.০
২৪।	কাঁচা মরিচ	৪৫	৮৫.৮	২.৮	০.১	৫.৯	৪.৭
২৫।	শশা	১৭	৯৫.১	০.৮	০.১	২.৯	০.৭
২৬।	রসুন	১৪৭	৬১.৬	৬.৯	০.৬	২৭.৬	২.১
২৭।	চাল কুমড়া	১০	৯৬.৫	০.৪	০.১	১.০	১.৭
২৮।	করোলা	৩১	৯০.৪	২.১	০.৩	৩.৬	২.৬
২৯।	লাউ	৩৪	৯০.৮	১.১	০.১	৬.৮	০.৬
৩০।	পটল	২৪	৯২.৬	২.০	০.৩	২.২	২.২
৩১।	চিচিংগা	২৪	৯৩.৪	০.৫	০.৩	৪.৫	০.৮
৩২।	ঢেড়শ	৩৯	৮৭.৭	২.১	০.২	৫.৭	৩.১
৩৩।	পিয়াজ	৫৯	৮৩.৭	১.৪	০.১	১২.২	১.৯
৩৪।	পেঁপে (কাঁচা)	৩০	৯০.৬	০.৮	০.১	৫.৭	১.৫
৩৫।	কলা (কাঁচা)	৭৭	৭৮.৯	২.০	০.৩	১৫.৫	২.৩
৩৬।	মিষ্টি কুমড়া	১৮	৯৩.৯	১.৪	০.৩	১.৩	২.৪
৩৭।	টমেটো (কাঁচা)	২৩	৯৩.৩	১.৯	০.২	২.৫	১.৭
৩৮।	টমেটো (পাকা)	১৬	৯৫.০	১.১	০.২	১.৪	১.৭

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
১১৪	১.৮	০.৫২	২৬	-	০.০১	০.১৮	৩৫.৮
৪৪	১.১	০.৪৮	৩২	০.০৬	০.০৫	০.০১	৮.৭
২১	০.৪	০.৫৭	৪	০.১০	০.০৩	০.০৭	১.৩
৩০	০.৫	০.৪০	৫	০.২০	০.০৬	০.০৫	১৬.১
২৬	০.৪	০.০৭	৩২৯	০.৫৫	০.০৪	০.০৯	১.৪
৩৩	০.৮	০.৪১	১	০.২২	০.০৩	০.০৩	৭২.৭
২২	১.৬	১.৯৭	১০	০.২৯	০.০৩	০.০৫	১০২.৩
১৩	০.৬	০.১৭	৪	০.০৭	০.১৬	০.০২	৭.২
২৫	১.৬	১.০৮	০	০.০৮	০.১৩	০.১২	২৪.১
৩০	০.৮	০.১০	০	-	০.০৬	০.০১	৩১.০
১৬	১.৮	০.৩৫	২৪	-	০.০৫	০.০৩	৯০.৬
২৬	০.৭	০.৫৮	১	-	০.০১	০.০২	৮.৭
১৬	১.৭	০.৪০	৫	-	০.১৭	০.০৩	১৯.৪
৩১	০.৪	০.৩২	-	-	০.০৪	০.০৬	১৮.৮
৯৩	০.৯	০.৩৪	১৯	০.২৭	০.০৪	০.১৬	১৭.৫
২৪	০.৯	০.৪১	২	০.০২	০.০৫	০.১৪	৪.৫
১৫	০.৬	০.২২	১	-	০.০৩	০.০২	১৮.৬
২২	০.৬	০.১৪	৫৬	০.১৪	০.০৯	০.০৬	৭.৩
৫২	০.৭	০.১১	৩৬৯	১.০৬	০.০৭	০.০৬	২১.১
১৬	০.৩	০.১৯	-	০.৩৮	০.০৭	০.০১	৩০.৬
১৩	০.২	০.৪১	৯	০.৫৪	০.০৪	০.০৪	১২.৩

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

শাক্ জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
৩৯।	লাল শাক্	৩২	৮৮.৮	৪.৫	০.৩	০.৫	৪.২
৪০।	ডাটা শাক্	২৫	৯১.০	২.০	০.৩	১.৫	৪.৪
৪১।	লাউ শাক্	২৬	৯০.২	২.৫	০.৬	০.৬	৪.৪
৪২।	কালো কচুশাক্	৬২	৮১.৮	৫.৬	১.২	৫.৩	৩.৭
৪৩।	সবুজ কচুশাক্	৫১	৮৪.৭	৪.০	১.১	৪.৪	৩.৭
৪৪।	পুঁই শাক্	২৫	৯১.৮	২.৪	০.৩	২.১	২.২
৪৫।	পাটশাক্	৩২	৮৭.৬	২.৯	০.৩	১.৭	৫.৮
৪৬।	মুলা শাক্	৩২	৯০.৭	১.৮	০.৭	৩.৪	২.৬
৪৭।	পালং শাক্	২৬	৯০.৮	৩.০	০.৫	০.৯	২.৯
৪৮।	কলমী শাক্	৪৩	৮৭.১	১.৯	০.৪	৬.০	৩.৭
৪৯।	হেলেঞ্চা শাক্	৪৯	৮৭.৪	২.০	০.৫	৮.৮	০.৫
৫০।	কচুর মুখী	১০৩	৭১.১	২.২	০.২	২১.০	৪.১
৫১।	গোল আলু (খোসা ছাড়া)	৬৬	৮১.৭	১.২	০.২	১৪.০	২.১
৫২।	মিষ্টি আলু (কমলা সুন্দরী)	৯৭	৭৩.৭	০.৯	০.৩	২১.১	৩.০
৫৩।	মিষ্টি আলু (হলদী)	১০৫	৭১.৭	০.৯	০.৩	২৩.১	৩.০
৫৪।	মিষ্টি আলু (সাদা)	৯৮	৭৩.৫	০.৬	০.৩	২১.৮	৩.০

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
২৫৬	৬.০	০.৯৬	৭৯৩	-	০.০৩	০.১৩	৪২.০
১৭১	৮.৪	০.৯৮	৭৪৩	-	০.০৩	০.১৮	৩৭.১
৯৪	৩.১	০.৪৯	১৯৮	-	০.০৭	০.১৭	৪৭.৭
৩৯২	২.১	০.৯৮	৬৯৯	৩.৩৬	০.০৬	০.৪৫	৬৩
২৩৫	৪.৯	০.৬৮	৫৯৬	২.০২	০.২২	০.২৬	৪৮.১
১১১	২.২	০.৩৫	১৭০	-	০.০২	০.৩৬	৫১.৮
১২০	৯.৭	১.৪৭	৩০৫	-	০.১	০.৫৫	৫৪.৪
১৪৭	২.৮	০.৪৮	১৫৬	-	০.০৮	০.০৯	৬৮.৯
৯০	২.২	০.৯০	৪০৯	২.০৩	০.০৩	০.০৯	২১.২
১০৭	২.২	০.৫১	১৯৯	-	০.১৪	০.৪	৩০.৪
৩১	১.৯	০.৫২	৫৩০	১.৪৬	০.০৪	০.১৬	৪৩.০
৩৫	০.৭	০.২৩	৪	২.৩৮	০.১২	০.০৩	৬.১
১১	০.৫	০.৭৯	২	০.০২	০.০৮	০.০৯	১৯.১
৩০	০.৬	০.৩০	৭১৯	০.২৬	০.০৮	০.০৬	২৩.০
২৫	১.০	০.১৪	৩	০.২৬	০.০৬	০.০২	২০.৪
২৫	১.৫	০.৩৮	১	০.২৬	০.০৮	০.০৬	২০.৩

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

ফল জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
৫৫।	ফজলী আম (পাকা)	৭০	৮১.৭	০.৯	০.৫	১৪.৭	১.৬
৫৬।	ল্যাংড়া আম (পাকা)	৮২	৭৮.৪	০.৮	০.৪	১৮.০	১.৬
৫৭।	কাঁঠাল (পাকা)	৭৪	৭৭.০	১.২	০.২	১৩.৩	৭.২
৫৮।	লিচু	৬২	৮১.৮	১.৪	০.৫	১০.২	৫.৫
৫৯।	সাগর কলা (পাকা)	৯৫	৭৫.২	১.৩	০.৮	১৯.২	২.৬
৬০।	আনারস জলডুগী (পাকা)	৪৩	৮৮.৭	০.৮	০.৪	৮.৩	১.৪
৬১।	আনারস (পাকা)	৪৭	৮৭.২	১.০	০.১	৯.৭	১.৪
৬২।	পেঁপে (পাকা)	৩৩	৯০.৫	০.৬	০.১	৬.৫	১.৭
৬৩।	তরমুজ (লাল পাকা)	২২	৯৪.২	০.৫	০.২	৪.৪	০.৪
৬৪।	কালোজাম	৩৯	৮৮.২	০.৯	০.৫	৬.১	৩.৫
৬৫।	তাল (পাকা)	৭৮	৭৯.৭	০.৫	০.৪	১৭.৮	০.৭
৬৬।	বাংগী (পাকা)	১৬	৯৫.৫	০.৩	০.২	২.৮	০.৮
৬৭।	পেয়ারা (বিভিন্ন প্রকার কাঁচা)	৬৩	৮১.৪	১.০	০.৫	১০.৯	৫.৪
৬৮।	আমলকী	৪৪	৮৬.৭	০.৮	০.১	৮.৩	৩.৪
৬৯।	কামরাংগা (পাকা)	৪১	৮৮.৭	০.৫	০.৭	৬.৭	২.৮
৭০।	জামবুরা	৩৮	৮৯.৯	০.৪	০.৩	৭.৭	১.০
৭১।	বেল (পাকা)	১১১	৬৮.৫	২.৯	০.৩	২০.৯	৭.০
৭২।	বিলাতী গাব (পাকা)	৬৭	৮১.২	০.৭	০.২	১৩.৯	৩.৮
৭৩।	আমড়া	৫১	৮৬.৭	১.১	০.৮	৮.৯	১.৬
৭৪।	বড়ই	৬০	৮৪.৩	১.৯	০.২	১২.৬	-
৭৫।	কদ্‌বেল	৬৪	৮০.৯	৩.১	০.৪	১০.৩	৩.৫

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
১৪	০.৫	০.৮৭	২৯২	১.১২	০.০৩	০.০৪	৩৪.৭
১৩	০.২	০.৬০	২৫	০.৯২	০.০৯	০.১০	১০৩.০
১৩	০.৩	০.৫৯	২	০.১১	০.১১	০.০৫	৩.৪
১১	০.৫	০.২৭	০	-	০.০২	০.০৬	১১.০
১১	০.৩	০.২৪	২	০.৭৫	০.০৫	০.০৮	১.০
২০	১.৬	০.৬০	-	০.১	০.১১	০.০৪	২০.৯
১৮	০.৭	০.২২	৫	০.১	০.২০	০.১২	৩৩.৯
২৯	০.৩	০.১৭	৬০	০.৩	০.০৮	০.০৩	৬১.৮
১২	০.৪	০.১৫	২৯	০.০৫	০.০২	০.০৪	২৩.৯
২৩	০.৮	০.২১	৯৩	-	০.০৯	০.০২	৭৪.১
১৬	১.৭	০.২৭	২০৮	-	০.০৪	০.০২	৩৫.১
২১	সামান্য	০.০৬	৪	০.০৭	০.১১	০.০৮	২৬.০
১৭	০.৭	০.৩১	৩৩	০.৭৩	০.২১	০.০৯	২২৮.৩
৩২	০.৯	০.৩০	১	-	০.০২	০.০৮	৪৫৩.৪
১০	০.৮	০.৩৮	৭	০.১৫	০.১২	০.০৪	৪৯.৪
৩৬	০.২	০.০৬	৩	০.২৪	০.০৬	০.০৪	১২১.৭
৪১	০.৪	০.২৬	-	-	০.০৩	০.০২	১১.৩
২৪	০.২	০.০৭	৮১	১.৮	০.০৩	০.১৪	১২.৮
৫৭	২.৮	০.১৭	-	-	০.২৮	০.০৪	৭৭.০
১৪	০.৮	০.৩২	২	-	০.০২	০.০৬	৬৬.১
৭৪	০.৭	০.৩৭	-	-	০.৮০	০.০৩	১২.৮

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

ফল জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
৭৬।	লেবু কাগজী	৫৬	৮৬.০	০.৮	১.০	১০.২	১.৩
৭৭।	কমলা	৪৪	৮৭.৭	০.৭	০.২	৮.৭	২.৪
৭৮।	ডেউয়া (পাকা)	১০৩	৭২.৩	১.২	০.৭	২১.১	৩.৬
৭৯।	আংগুর (হালকা সবুজ)	৯৪	৭৫.৩	০.৫	০.৬	২০.২	২.৯
৮০।	জামরুল	৪০	৮৯.৫	০.৭	০.৩	৮.০	১.২
৮১।	মিষ্টি তেতুঁল (পাকা)	২৭০	২৭.৯	৩.২	০.৪	৬০.৮	৫.১
৮২।	আতাফল	৮৫	৭৬.১	১.৮	০.৩	১৬.৬	৪.৪
৮৩।	ডুমুর (পাকা)	৪০	৮৮.১	১.৩	০.২	৬.৭	৩.১
৮৪।	কচি তালের শাস	৩১	৯২.০	০.৬	০.১	৬.৯	০.৩
৮৫।	আপেল খোসাসহ	৬২	৮৩.৩	০.৩	০.২	১৩.৫	২.৪
৮৬।	নাশপাতি	৬২	৮৩.০	০.৬	০.৩	১২.৩	৩.৬

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
৬৫	০.৩	০.০৭	৪	০.৮০	০.০২	০.০৩	৪৫.৯
২৩	০.২	০.০৭	১৯	০.২৪	০.০৪	০.০১	৫৪.০
৫৭	০.৮	১.৬৮	৩১০	-	০.০৩	০.২৩	৬৫.৬
২২	০.৫	০.০৭	৩	০.৪০	০.১০	০.০৬	২৯.০
৯	০.৩	০.০৮	-	-	০.০১	০.০৫	২২.৩
১২৭	৪.০	০.১১	১	০.০৯	০.৩৫	০.১২	১১.২
১৭	১.০	০.৩৩	০	-	০.০৭	০.১৪	৩৮.০
৮০	১.১	০.১৫	৭	০.১১	০.০৬	০.০৫	৫.০
৪৩	০.৫	-	-	-	০.০১	০.০১	৪.০
৬	০.১	০.০৪	৩	০.১৮	০.০৯	০.০৩	৪.০
৬	০.৫	০.০৮	০	০.১২	০.০৩	০.০৩	৩.৮

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান (খ

মাছ জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
৮৭।	সরপুঁটি	১৭৫	৭০.৬	১৭.৪	১১.৭	০	০
৮৮।	বোয়াল (কাঁটা ছাড়া)	৮০	৮০.৮	১৫.৪	২.১	০	০
৮৯।	কাত্‌লা	১০৩	৭৬.৭	১৯.৯	২.৬	০	০
৯০।	কই (দেশী)	১৩০	৭৩.০	১৭.৫	৬.৬	০	০
৯১।	কই (থাই)	১৩৯	৭৩.০	১৭.৫	৭.৭	০	০
৯২।	ইলিশ (কাঁটা ছাড়া)	২২৩	৬২.৭	১৮.০	১৬.৮	০	০
৯৩।	আইড় (কাঁটা ছাড়া)	৮৯	৭৮.১	১৭.০	২.৩	০	০
৯৪।	রুই (নদীর)	৯০	৭৬.৭	১৬.৬	২.৭	০	০
৯৫।	রুই (কাঁটা ছাড়া)	১০৫	৭৬.৩	২০.৬	২.৬	০	০
৯৬।	তেলাপিয়া (কাঁটা ছাড়া)	১১০	৭৬.২	২০.৮	৩.০	০	০
৯৭।	মাগুর (কাঁটা ছাড়া)	১০৩	৭৭.৬	১৫.৬	৪.৬	০	০
৯৮।	শোল (কাঁটা ছাড়া)	১০১	৭৮.৪	১৭.৭	৩.৩	০	০
৯৯।	শিং মাছ (কাঁটা ছাড়া)	১০১	৭৬.৭	১৭.২	৩.৫	০	০
১০০।	পাংগাস (কাঁটা ছাড়া)	১৬২	৭০.৮	১৫.৯	১১.০	০	০
১০১।	টেংরা (বিভিন্ন প্রজাতি)	১১৪	৭৩.৬	১৮.২	৪.৬	০	০
১০২।	কাঁচ্‌কি (বিভিন্ন প্রজাতি)	৯৩	৮০.৪	১৬.১	৩.২	০	০
১০৩।	মলা	১০৮	৭৭.৫	১৭.১	৪.৪	০	০
১০৪।	চিংড়ী (গল্‌দা)	১০২	৭৪.৮	২০.৯	২.০	০	০
১০৫।	চিংড়ী	৭৫	৭৯.৯	১৭.৬	০.৬	০	০
১০৬।	গুলশা	৮৬	৭৮.৬	১৫.৪	২.৭	০	০
১০৭।	ফেশা	১০৫	৭৪.৮	১৭.৭	৩.৮	০	০

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
২২৭	০.৬	০.৭৪	-	-	০.০২	০.০৭	সামান্য
৮৩	০.৮	০.২৭	১	-	০.০৬	০.০৭	সামান্য
৫৩০	০.৬	০.৪৮	৩	-	০.০৮	০.০৯	সামান্য
৪১০	১.২	১.১৩	২১৫	-	০.০৩	০.১৮	সামান্য
৬৪	১.২	১.১৩	২১৫	-	০.০৩	০.১৮	সামান্য
৮৬	১.৩	০.৫৪	-	-	০.১২	০.১৪	সামান্য
১১	০.৯	০.২৩	-	-	০.০৭	০.০৮	সামান্য
৬৫০	১.০	১.১৩	-	-	০.০৫	০.০৭	সামান্য
৩০	০.৪	১.১৩	৪	-	০.৬১	০.১০	সামান্য
১৯	০.৫	১.৪০	২	০.৭১	০.৯৭	০.০৯	সামান্য
২৭	০.৮	০.৫৩	১৫	-	০.০৩	০.০৬	সামান্য
১০৪	১.০	০.৩১	-	-	০.০৪	০.০৫	সামান্য
৩১৯	২.১	০.৫৫	১৬	-	০.০৮	০.০৯	সামান্য
১৪	০.১	১.৮৫	৫	-	০.১৫	০.০৬	সামান্য
৬২৭	২.৮	০.৭৭	৪৩	-	০.০১	০.০৪	সামান্য
৪৮৯	২.৪	৩.১০	৩৮	০.৭৭	০.০৩	০.০৫	সামান্য
৭৬৭	৩.৮	৩.১৯	২৬৮০	-	-	-	সামান্য
১৮	০.৭	১.২৫	২	-	-	-	সামান্য
১৫	০.৫	১.০০	১	-	-	-	সামান্য
৩০০	১.৩	০.৮৮	-	-	০.০১	০.০৩	সামান্য
৪৫২	১.৮	৩.২০	১২	০.৪৪	০.০৫	০.২৪	সামান্য

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

মাংস জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১০৮।	গরুর মাংস (হাড় ছাড়া)	২০৭	৬৫.৪	১৯.৭	১৪.২	০	০
১০৯।	গরুর কলিজা	১৩০	৭০.৮	২০.৪	৩.৬	৩.৯	০
১১০।	খাসীর মাংস	১১৮	৭৪.২	২১.৪	৩.৬	০	০
১১১।	মহিষের মাংস	৯৫	৭৮.৭	১৯.৪	১.৯	০	০
১১২।	মুরগীর রানের মাংস	১২৮	৭১.৯	১৯.২	৫.৭	০	০
১১৩।	মুরগীর বুকের মাংস	১০৬	৭২.৯	২২.৩	১.৮	০	০
১১৪।	হাঁসের মাংস	১৩০	৭২.৩	২১.৬	৪.৮	০	০
১১৫।	কবুতরের মাংস	১৩৭	৭০.৪	২৩.৩	৪.৯	০	০

ডিম জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১১৬।	মুরগীর ডিম (দেশী)	১৫৮	৭৬.১	১৩.৩	১১.৬	সামান্য	০
১১৭।	মুরগীর ডিম (ফার্ম)	১৩৯	৭২.৩	১৪.৫	৯.০	সামান্য	০
১১৮।	মুরগীর ডিমের কুসুম (দেশী)	৩২৫	৫১.৯	১৬.০	২৭.৮	২.৬	০
১১৯।	হাঁসের ডিম	১৮৮	৬৯.৭	১৩.৫	১৪.৩	১.৪	০

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
৫	২.২	৪.৬	১৫	০.৩৫	০.০৫	০.২	০
৪	৩.৫	৩.৭১	৪৯৬৮	০.৩৮	০.১৯	২.৭৬	১.৩
১২	২.৮	৪.০০	০	০.১৮	০.১১	০.৪৯	০
১২	১.৬	১.৯৩	০	০.০৫	০.০৪	০.২	০
১৮	১.০	২.০৯	২৩	০.২৪	০.০৯	০.১২	০
১৫	০.৫	১.৭০	২৫	০.১২	০.১২	০.০৭	০
৪	২.৪	১.৯০	২৪	০.০২	০.৩৬	০.৪৫	০
১২	২.৫	২.৯৪	১৮	-	০.২৬	০.২৬	৫.৬

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
৬০	১.৭	২.০৩	২১৩	১.২	০.১৮	০.৪০	০
২৯	১.৫	২.৩৬	১৬৫	০.৮৩	০.১৮	০.৪০	০
১২০	৪.৮	৩.৩৩	৪৯৬	৪.১৬	০.২৩	০.৪৯	০
৬৫	২.৪	১.৪১	৩৬২	১.৩৯	০.১২	০.২৬	০

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১২০।	গুড়া দুধ (গরু) ননীসহ	৪৯৭	৩.২	২৬.৬	২৬.৭	৩৭.৫	০
১২১।	গুড়া দুধ (গরু) ননী ছাড়া	৩৫৮	৩.৮	৩৭.৬	১.০	৪৯.৮	০
১২২।	তরল দুধ (গরু) ননী ছাড়া	৩০	৯২.১	৩.১	০.১	৪.১	০
১২৩।	তরল দুধ (গরু) ননীসহ	৬৩	৮৮.৩	৩.১	৩.৭	৪.৩	০
১২৪।	মহিষের দুধ	১০১	৮৩.৩	৩.৮	৭.৫	৪.৭	০
১২৫।	ছাগলের দুধ	৬৮	৮৭.২	৩.৫	৪.১	৪.৩	০
১২৬।	বুকের দুধ (মায়ের)	৬৯	৮৭.৪	১.২	৪.০	৭.২	০
১২৭।	শালদুধ (কলষ্ট্রাম)	৫৮	৮৮.২	২.০	২.৬	৬.৬	০
১২৮।	ঘোল	৩৩	৯২.২	৩.৪	০.৭	৩.১	০
১২৯।	পনির	৩৪৬	৪০.৩	২৪.৬	২৫.১	৫.৪	০
১৩০।	দৈ-মিষ্টি	৯৪	৮০.৬	৩.২	৪.০	১১.৪	০

চর্বি ও তৈল জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১৩১।	ঘি-গরুর দুধের	৮৯৮	০.১	০	৯৯.৮	০	০
১৩২।	মাখন নোন্‌তা	৭৩৩	১৫.৯	০.৯	৮১	০.২	০
১৩৩।	মেয়োনিজ নোনতা	৭৩২	১৬.৪	১.৫	৮০.৬	০	০
১৩৪।	কডলিভার তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০
১৩৫।	সয়াবিন তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০
১৩৬।	পাম তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০
১৩৭।	সরিষার তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
৯৫৯	০.৭	৩.৭১	২৩৮	০.৫৯	০.৩১	১.৩৭	১০.৭
১৩৭০	১.১	৪.৭	০	০.১	০.৪৫	১.৬৪	৫.০
১০৩	০.১	০.৪৫	০	০.০১	০.০৬	০.২৮	১.০
১০৩	০.১	০.৪৫	৩২	০.০৮	০.০৬	০.২৮	২.০
২০৬	০.২	০.২২	৪৭	-	০.০৫	০.২২	১.৭
১৫২	০.২	০.৩	৩২	০.০৩	০.০৫	০.০৯	১.২
৩২	০.১	০.২৬	৫৬	০.৩৪	০.০২	০.০৩	৪.৩
২৮	০.১	০.৬০	১৬৬	১.৩০	সামান্য	০.০৩	৭.০
১০৩	০	০.৪১	৮	০.০১	০.০৪	০.১৭	০.৭
৭৯০	০.৩	৩.৫৫	২০৫	০.৪৯	০.০২	০.৪৭	সামান্য
১০৩	০.১	০.৪৫	৩২	০.০৮	০.০৫	০.১৬	১.০

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
১	০.২	০.০১	৬৪২	৩.৩১	০	সামান্য	০
২৪	০	০.০৯	৬৩৩	১.৮৫	০.০১	০.০৩	০
৮	০.৩	০.২৫	৭৩	১৬.৮৭	০.০১	০.০৫	০
১	০.১	০.০৬	২৫০০	৩০	০	০	০
০	০.১	০.০১	০	১৬.০৬	০	০	০
০	০	০	০	৩৩.১২	০	০	০
০	০	০	০	-	০	০	০

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

বাদাম, বীজ জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১৩৮।	চিনা বাদাম	৫৮৫	৫.৩	২২.৫	৪৬.৬	১৪.৮	৮.৫
১৩৯।	হিজলী বাদাম	৫৯৫	৫.৯	১৮.০	৪৬.৯	২৩.৫	৩.৩
১৪০।	পেস্তা	৫৭৪	৪.৫	১৯.২	৪৪.৯	১৮.২	১০.৩
১৪১।	কাঁঠালের বীচি	১৫১	৬০.১	৫.৬	০.৪	৩০.৪	১.৫
১৪২।	সরিষা	৫০১	৮.৫	২২.০	৩৫.০	১৮.৫	১১.৮
১৪৩।	নারিকেল	৩৮৯	৪২.৯	৩.৩	৩৬.৭	৬.৯	৯.২
১৪৪।	নারিকেল (শুকনা)	৬৫২	৪.৩	৫.৬	৬২.২	৮.৫	১৭.৮
১৪৫।	তিল	৫৬৩	৫.৩	১৭.৭	৪৫.৮	১৪.৩	১১.৭

মশ্‌লা জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১৪৬।	শুক্‌না মরিচ	৩১৩	১০.০	১৫.৯	৬.২	৩৫.২	২৬.৬
১৪৭।	হলুদ	৩৩৫	১১.৫	৬.৯	৮.৪	৪৭.৩	২১.১
১৪৮।	আদা	৭২	৮১.১	১.৯	০.৮	১৩.৩	২.০
১৪৯।	ধনিয়া	৩৩৬	১১.২	১৪.১	১৬.১	১৩.৪	৪০.৮
১৫০।	এলাচ্‌	২৬১	২০.০	১০.২	২.২	৩৭.৮	২৪.৪
১৫১।	দারচিনি গুড়া	২৪৩	১০.৬	৪.০	১.২	২৭.৫	৫৩.১
১৫২।	তেজপাতা	৩৫৩	৫.৪	৭.৬	৮.৪	৪৮.৭	২৬.৩

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
৭৬	২.৯	৩.৩৯	০	১০.০৯	০.৭৭	০.১২	০
৫০	৫	৫.৭৮	১	০.৮৫	০.৬৩	০.১৯	০
১১৭	৫.৩	২.২	১৬	২.৩	০.৮০	০.২০	৫.৩
৪০	১.৫	-	০	-	০.২১	০.১১	৮.৬
২৫৭	৮.৯	৫.৮৭	১	৫.০৭	০.৬৫	০.২৬	০
১৬	২.২	০.৭৪	০	০.৭৩	০.০৫	০.০৪	৩.৩
৩২	৪.৭	০.৯০	০	১.২৬	০.০৬	০.০২	০
৯৬৯	১০.৫	৭.৭০	০	২.০০	০.৭৯	০.৩৪	০

ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
১৬০	২.৩	২.৪৮	৭৪৭	১৯.৭১	০.৯৩	০.৪৩	৪৭.৪
১৬৮	৩৩.২	৩.৭৮	১	৩.১	০.০৯	০.১৭	০
১৭	১.১	০.৩৬	০	০.২৬	০.০৩	০.০৩	৫
৬৩০	১৭.৯	৪.৫৮	০	-	০.২২	০.৩৫	০
১৩০	৪.৬	২.৮১	০	-	০.২২	০.১৭	০
১০০০	৮.৩	১.৮৩	১৫	২.৩২	০.০২	০.০৪	৩.৮
৮৩৪	৪৩.০	৩.৭০	৩০৯	-	০	০	৪৬.৫

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

পানীয় জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১৫৩।	খাবার পানি	০	১০০	০	০	০	০
১৫৪।	ডাবের পানি	২০	৯৪.৫	০.৬	০.৩	৩.২	১.১
১৫৫।	আখের রস	৩৩	৯১.৭	০.৭	০	৭.৫	০
১৫৬।	কোমল পানীয়	৪১	৮৯.৬	০	০	১০.৩	০
১৫৭।	সয়াবিন দুধ (চিনি ছাড়া)	৫৪	৮৭.৮	২.৮	২.৪	৪.৯	০.৫
১৫৮।	লিকার চা (চিনিসহ)	২৯	৯২.৪	০.২১	০.০	৭.১	০.১
১৫৯।	চা-দুধ (চিনিসহ)	৪১	৯০.৪	০.৭৩	০.৮	৭.৬	০.২
১৬০।	কফি, পাউডার	৩৫৫	৩.১	১২.২	০.৫	৭৫.৪	০
১৬১।	কফি দুধ ও চিনিসহ	৩৮	৯১.৩	০.৯	০.৮	৬.৮	০

মিশ্রিত(পাঁচ মিশালী) জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১৬২।	মধু	৩২৬	১৮.২	০.৩	০	৮১.১	০.২
১৬৩।	চিনি (সাদা)	৩৯৮	০.৪	০	০	৯৯.৫	০
১৬৪।	মিষ্টি বিস্কুট	৩৪৪	২৪.৩	৫.৮	১০.০	৫৬.৭	২.৪
১৬৫।	বনরুটি-বান/রোল	২৭০	৩৩.০	৮.৮	২.৮	৫০.৯	২.৮
১৬৬।	পাউরুটি	২৭২	৩০.৪	৮	১.৪	৫৫.৬	২.৫
১৬৭।	পায়েশ	২০৫	৫৩.৮	৪.৩	৪.৭	৩৬.২	০.২
১৬৮।	সেমাই সিদ্ধ	১৫১	৬১.৬	৩.৯	০.৩	৩২.৬	১.৪
১৬৯।	রুটি	২৪৬	৩৭.৩	৭.৫	১.২	৪৯.৭	৩.১
১৭০।	খিচুরী	১৬৩	৬৫.৭	৫.১	৭.৪	১৭.৭	২.৫

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
৩	০.১	০.০০২	০	০	০	০	০
২০	০.২	০.১০	০	০	০.০৬	০.০৩	৩.৩
৮	১.১	০.০১	০	০	০.০৪	সামান্য	সামান্য
৬	০.৩	০.০২	০	০	০	০	০
১৩	০.৪৩	০.৩	০	০.৩২	০.০৬	০.০৫	০
৫	০.১	০.০৩	০	-	০.০০	০.০১	০
২৮	০.৪	০.১১	৬	-	০.০১	০.০৪	০.৩
১৪১	৪.৪	০.৩৫	০	০	০.০১	০.০৭	০
৩৩	০.২	০.১২	৭	০.০২	০.০১	০.০৪	০.৩

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
৫	০.৫	০.৪৯	০	০	০	০.০৬	১.৪
১২	০.২	০.১০	০	০	০	০	০
৬	০.৪	০.৩৪	০	০.১০	০.০১	০.০১	০.১
৭	০.৪	০.৫৮	০	০.২২	০.০৪	০.০২	০
৬	০.৪	০.৩৩	০	০.০৪	০.০১	০.০১	০
২৮৭	৫.৩	০.৮৫	৮৪২	-	০.০২	০.১০	১৯.৮
৭৩	২.৭	১.৫২	৩৯১	১.৫৮	০.১১	০.২৪	০
২৭	১.১	০.১৩	৩.১	০.২৬	০.০৫	০.০২	১৪.৪
১৪০	২.২	০.৩৫	২০১	-	০.০২	০.৩১	২৭.৩

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

মিশ্রিত(পাঁচ মিশালী) জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১৭১।	প্লেইন পোলাও	১২৮	৬৯.৭	২.২	২.৩	২৪.১	১.১
১৭২।	মিষ্টি কুমড়া সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	২৯	৯০.৪	২.২	০.৫	২.১	৩.৮
১৭৩।	টমেটো পাকা সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৩০	৯০.৬	২.১	০.৫	২.৭	৩.১
১৭৪।	দেশী মুরগীর ডিম সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	১৭৯	৭২.৯	১৫.১	১৩.২	০.০	০
১৭৫।	ফার্মের মুরগীর ডিম সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	১৫৮	৬৮.৫	১৬.৫	১০.২	০	০
১৭৬।	হাঁসের ডিম সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	২১৪	৬৫.৬	১৫.৩	১৬.২	১.৬	০
১৭৭।	বেকিং পাউডার	১৭২	৬.৩	৫.২	০	৩৭.৮	০
১৭৮।	পান পাতা	৪২	৮৫.৪	৩.১	০.৪	৪.১	৪.৭
১৭৯।	লবন	০	সামান্য	০	০	০	০
১৮০।	সবুজ ডাটা শাক সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৩০	৮৯.৩	২.৩	০.৩	১.৭	৫.১
১৮১।	লাল শাক সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৩৭	৮৬.৮	৫.৩	০.৪	০.৬	৫.০
১৮২।	হারিকাবাব (গরু)	২৩৩	৬০.৪	১২.৭	১৬.৯	৬.৬	১.৮
১৮৩।	ছোলা সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	১৮২	৫২.৫	১০.৬	৩.১	২৩.৩	৯.১
১৮৪।	বেগুন সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	২৬	৯০.৬	২.১	০.১	২.১	৪.৪
১৮৫।	বাঁধাকপি সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	২৭	৯১.৭	১.৭	০.৪	২.৯	২.৮
১৮৬।	গাজর সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৪৩	৮৭.৩	১.১	০.৩	৭.৩	৩.১
১৮৭।	ফুলকপি সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	২৮	৯১.৪	২.৭	০.৩	২.৭	২.১
১৮৮।	কচুর মুখী সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	১১৫	৬৭.৫	২.৫	০.২	২৩.৬	৪.৬
১৮৯।	দুধ কচু সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	১১৩	৬৮.৫	২.৪	০.২	২৩.১	৪.৬
১৯০।	বরবটি সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৪০	৮৬.৫	৩.১	০.৪	৩.০	৬.৩
১৯১।	ওল কচু সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৮৩	৭৬.১	১.৩	০.১	১৬.৯	৪.৬
১৯২।	করোলা সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৩৫	৮৯.০	২.৩	০.৪	৪.১	৩.০

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
২৫৫	৪.৮	১.০৬	১০৩০	-	০.০২	০.১২	৮৪.৪
৫৬	০.৭	০.২৩	০	২.৬৭	০.০৫	০.০৭	৩.৫
৬৮	১.৯	২.১৯	২২৯	১.৩৬	০.১৭	০.৩৬	০
৩৫	০.৫	০.৩৪	৫	০.২৩	০.০৪	০.০৪	৭.৩
৩৬	০.৮	০.৩৭	১	০.২২	০.০২	০.০২	৪৬.৬
৩৪	০.৫	০.০৭	৩৬৪	০.৬৮	০.০৪	০.০৭	০.৭
১১৩০০	সামান্য	সামান্য	০	০	০	০	০
২৩০	৭.০	১.০০	-	-	০.০৭	০.০৩	৫.০
সামান্য	সামান্য	সামান্য	০	০	০	০	০
৮৩	২.১	০.৮৭	০	০.৯৩	০.০৫	০.০৩	০
২৬	১.০	০.৭৩	০	০.৫	০.১৫	০.০৫	০
১১৯	২.২	০.৬৮	০	০.২৪	০.২১	০.৩৪	০
১৩	১.১	০.৬৯	২৪	০.১৩	০.০৮	০.০২	০.২
৫	০.৪	০.৩৩	০	০.০৩	০.০১	০.০০৫	০
১১	২.৭	১.১০	০	০.৩০	০.০৭	০.০৪	০
১১	০.৯	০.৫৭	০	০.০৫	০.০৪	০.০২	০
৯৪	৪.০	১.২৬	২	১.৩৫	০.১০	০.১০	০
১২	২.২	১.৭২	১	০.১৬	০.২৪	০.০৫	০
৩৭	২.৩	১.৬৪	২	০.৪৯	০.১৬	০.০৫	০
২৪	০.৪	০.৫২	৪	০.১১	০.০২	০.০৬	১.০
৫৪	০.৫	০.৯০	৮	-	০.১০	০.০২	টি আর
২০	১.৭	০.৩৯	৬	-	০.১৩	০.০৩	১৩.৫

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান

মিশ্রিত(পাঁচ মিশালী) জাতীয় খাদ্য

ক্রমিক নং	খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)
১৯৩।	করোলা ভাজি	১৩০	৭৪.০	৩.১	৯.১	৭.১	৪.১
১৯৪।	পটল সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	২৮	৯১.৬	২.৩	০.৪	২.৫	২.৫
১৯৫।	কাকরোল সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৬৯	৮১.৫	২.২	০.৫	১৩.৪	১.৩
১৯৬।	পুঁই শাক সিদ্ধ	৩৩	৮৯.২	৩.১	০.৪	২.৮	২.৯
১৯৭।	ঢেড়শ টমেটো ভূনা	১২৭	৭২.১	৩.৪	৭.৪	৯.০	৫.০
১৯৮।	মুসুরী ডাল সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	১৫৫	৫৬.৯	১৩.৬	০.৪	২১.২	৬.৫
১৯৯।	ঢেড়শ সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৩২	৯০.০	১.৭	০.১	৪.৭	২.৫
২০০।	কাঁচা পেপে সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৩২	৮৯.৯	০.৮	০.১	৬.১	১.৬
২০১।	মটর সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	১৭০	৫৪.০	১১.৫	১.১	২৫.২	৬.৮
২০২।	কাঁচা কলা সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৭৬	৭৯.৩	১.৯	০.৩	১৫.২	২.৩
২০৩।	গোলআলু সিদ্ধ (লবনসহ)	৮৪	৭৭.০	১.৪	০.৮	১৬.৬	২.৫
২০৪।	গোল আলু সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	৬৭	৮১.৫	১.২	০.২	১৪.২	২.১
২০৫।	মূলা সিদ্ধ (লবন ছাড়া)	২৪	৯২.৪	১.২	০.১	৩.৩	২.১

(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

ক্যাল্‌সিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
৩১	২.৬	০.৪৬	১৫	০.২৬	০.০৬	০.০৫	৯৯.০
৭২	০.৭	০.২৩	১৫	০.২১	০.০২	০.১০	৮.৭
১২৮	১.৪	০.৬৭	২৬	০.৮১	০.০৬	০.২২	২৪.৫
১৭	০.৬	০.২০	১	-	০.০২	০.০২	১২.২
২২	০.৬	০.১২	৫৩	০.১৩	০.০৬	০.০৪	৪.৩
৭৯	১.১	০.১৪	৫৫৪	১.৬১	০.০৮	০.০৭	২০.১
৩৫	০.৫	০.৩৮	০	০	০.৪০	সামান্য	৯.২
২৪	০.৪	০.৬৬	১৬	০.৯৮	০.০৫	০.০৫	১৪.১
১৯২	৭.৪	০.৮৬	৭৮৯	-	০.০২	০.১৪	১৭.৫
১৫৭	৩.১	১.২৩	৬৭২	৩.৭০	০.০৪	০.১১	১৫.৫
৪০	০.৮	০.২৩	৪	২.৬৭	০.১০	০.০৩	৪.৮
৪৬	১.১	০.২৩	০	২.৬৭	০.১৩	০.০৩	৪.৯
৫২	১.১	০.২৩	০	২.৬৭	০.০৮	০.০৩	৫.২

ম্যানুয়াল প্রণয়নে সহায়ক পুস্তিকা ঃ

১। সু-স্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি- মোঃ মাহফুজ আলী

২। সমন্বিত ফলিত পুষ্টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট্ (বারটান)

৩। খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট্ (বারটান)

৪। খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি ম্যানুয়াল, ইউএসএইড ও এফএও, ২০১৫

৫। বসত-বাড়ীতে শাক-সব্জি ও ফল উৎপাদন প্রশিক্ষন ম্যানুয়াল, ইউএসএইড ও এফএও, ২০১৫

৬। মৎস্য চাষ প্রশিক্ষন ম্যানুয়াল, ইউএসএইড ও এফএও, ২০১৫

৭। প্রানীসম্পদ প্রশিক্ষন ম্যানুয়াল, ইউএসএইড ও এফএও, ২০১৫

৮। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রিপোর্ট ২০১৩

৯। হেল্থ উইকিপিডিয়া

১০। Food Compositon Table for Bangladesh, 1NFS, Dhaka Universityh, 2014

১১। বাংলাদেশের খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান- সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ প্রকল্প এবং বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট্ (বারটান)-২০১৫

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

দিন/সময়	বক্তব্যের বিষয়	উপস্থাপনকারী সংস্থা
১ম দিন		
০৯.০০-০৯.৩০	রেজিস্ট্রেশন	
০৯.৩০-১০.০০	প্রাক-মূল্যায়ন	বারটান
১০.০০-১১.০০	খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক ধারণা	বারটান
১১.০০-১২.০০	মূখ্য পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ	বারটান
১২.০০-০১.০০	গৌন পুষ্টি পুষ্টি উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ	বারটান
০১.০০-০২.০০	**বিরতি**	
০২.০০-০৩.০০	সুষম খাদ্য	বারটান
০৩.০০-০৪.০০	খাদ্যের পুষ্টিমান	বারটান
২য় দিন		
১০.০০-১১.০০	বসত-বাড়ীতে শাক সব্জির চাষ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১১.০০-১২.০০	পুষ্টি উন্নয়নে মাছের চাষ	মৎস্য অধিদপ্তর
১২.০০-০১.০০	বাড়ীর আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
	বাড়ীর আঙ্গিনায় ফল চাষ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০১.০০-০২.০০	**বিরতি**	
০২.০০-০৩.০০	পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নে বনজ ও ভেষজ গাছের ভূমিকা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০৩.০০-০৪.০০	মাঠ পরিদর্শন	বারটান
৩য় দিন		
০৯.০০-১০.০০	পুষ্টি সম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও রন্ধন পদ্ধতি	বারটান
১০.০০-১১.০০	পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	বারটান
১১.০০-১২.০০	অপুষ্টিজনিত রোগঃ রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার	বারটান
১২.০০-০১.০০	নিরাপদ খাদ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	বারটান
	বিরতি	
০১.০০-০২.০০	পুষ্টি উন্নয়নে নারীর ভূমিকা	বারটান
০২.০০-০৩.০০	প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন ও সমাপনী	বারটান

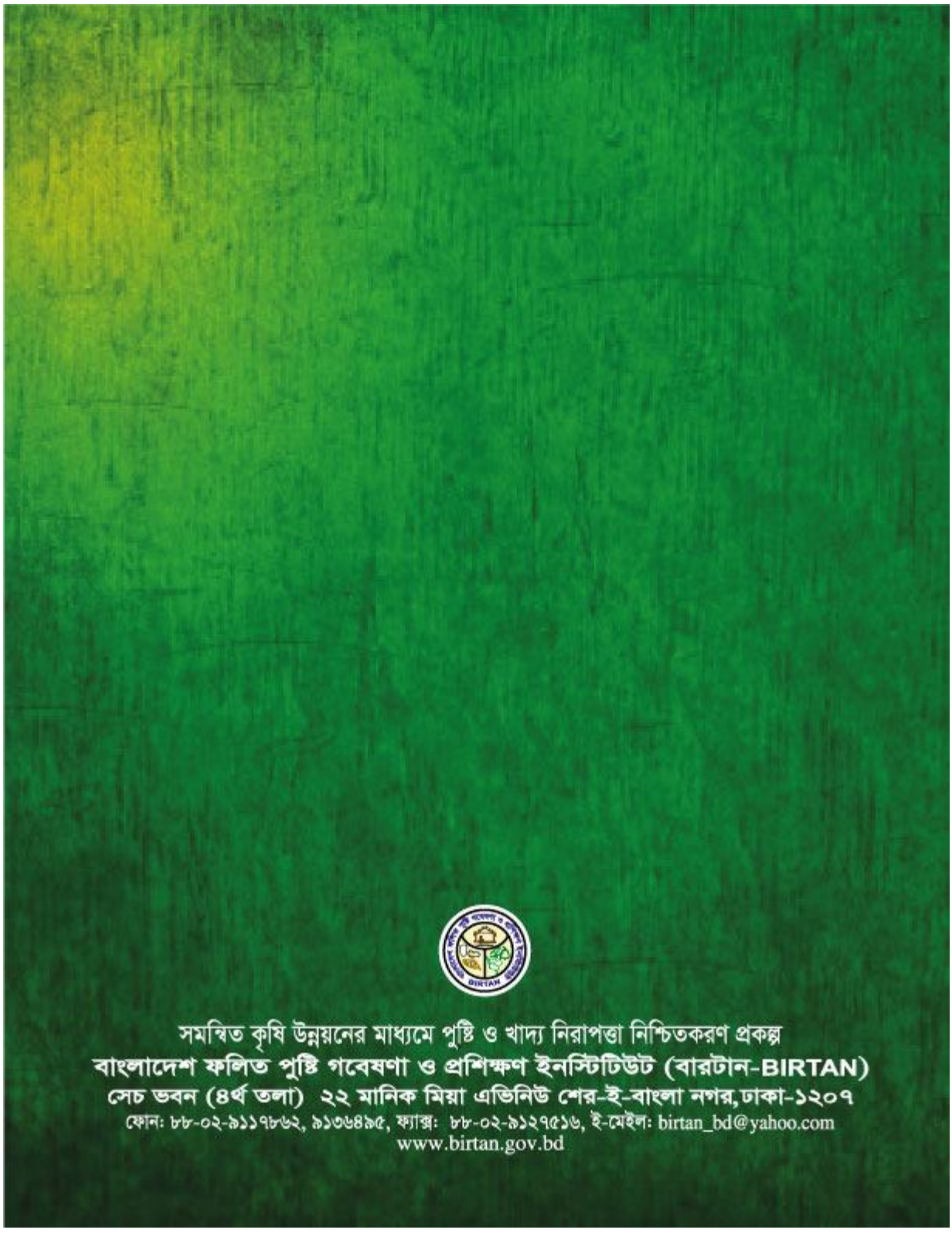

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN)
সেচ ভবন (৪র্থ তলা) ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-৯১১৭৮৬২, ৯১৩৬৪৯৫, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৭৫১৬, ই-মেইল: birtan_bd@yahoo.com
www.birtan.gov.bd

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি প্রশিক্ষন ম্যানুয়াল

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN)